প্রথম বর্ষ ।। পঞ্চম সংখ্যা ।। ভাদ্র ।। ১৩৮২

আনন্দমেলা

বিনি কেসমেন্টস্

স্কুলের পোষাক
আর খেলাধূলার
জন্যে সেরা কাপড়

বিনী

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের জন্যে টেঁকসই সূতী কাপড়

BCCM-42-75 BEN

আনন্দমেলা

প্রথম বর্ষ ॥ পঞ্চম সংখ্যা
ভাদ্র ॥ ১৩৮২
দেড় টাকা

ছড়া — নরেশ গুহ ৪

উপন্যাস — কাপালিকরা **এখনও** আছে। বিমল কর ২৮
রাজা হওয়ার ঝকমারি। বিমল মিত্র ৩৮

গল্প — চোরে ডাকাতে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১২
ভাগ্যিস ইনু ছিল। শেখর বসু ১৭
ফক্‌রা নিশি। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪

ইতিহাসের গল্প — রবিনহুডের রাজা। উমা দাশগুপ্ত ৪৮

দেশে-বিদেশে — সব শিশুদের অন্তরে। অরুণ বাগচী ২১
ঘুড়ির গল্প। কল্লোল মজুমদার ৩৬

বিজ্ঞান-বিচিত্রা — পিরামিডের শক্তি। চন্দ্রবর্মা ৮
বাসুকি যখন নড়েন। সাধন উপাধ্যায় ৫৪

কমিকস — টিনটিন। কাঁকড়া-রহস্য ৬, ৭, ১০, ১১
টারজান। ৪৬, ৪৭, ৫০, ৫১

খেলাধূলা — কে বড় ? আলি, না জো লুই। স্ট্রাইকার ৪৩
সেরা ক্রিকেটার টাট্টু ৪৫

নিয়মিত বিভাগ — ধাঁধা ৫, আচ্ছা বলো তো ৫
ম্যাজিকের মতো ১৫
জাদুঘর। শ্রীপান্থ ১৬
মজার অঙ্ক, অঙ্কের মজা ২০
জানা না-জানা ২৭, ৩৩
রাজায় রাজায় ৩৪
ম্যাজিক। পি সি সরকার জুনিয়ার ৩৫
বিন্দু বিসর্গ। ইন্দ্রমিত্র ৪২
আজব চিড়িয়াখানা। বহুরূপী ৫২
তোমাদের পাতা ৫৩

প্রচ্ছদ — বাবুল ঘোষ

সম্পাদক ॥ অশোককুমার সরকার
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি. আই. টি রোড, কলিকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

পূর্বাঞ্চলে বিমানের জন্য অতিরিক্ত মাশুল ১৫ পয়সা

ছড়া / নরেশ গুহ

সমুদ্রতীর

এইখানে নীল সাগরতীরে হয়তো ছিল দুর্গপ্রাকার
শত জোয়ার ঢেউয়ের ফেনার প্রণাম রাখার।
হয়তো ছিলো সেনাদলের আসা-যাওয়া,
আছড়ে-পড়া দেশবিদেশের পালের হাওয়া।
এখন শুধুই ঝাউয়ের সারি,
ঝিনুক-ঢাকা বালিয়াড়ি—
যেখানে আজ দিনের শেষে
শব্দ আর স্তব্ধ মেশে।
যেখানে আজ গরিব মেয়ে খুঁজে বেড়ায় শাঁখের কড়ি,
হাঁটুজলে ঢেউয়েরা দেয় গড়াগড়ি।
আলো-সকাল, কালো-বিকেল বালেশ্বরে
ময়লা জলের জোয়ার আসে, ভাঁটা পড়ে॥

বড়ো খবর

সূর্য থাকেন দিনের বেলায়, রাত্রে থাকেন চাঁদ,
আকাশ ভরে গ্রহতারায়, এই বড়ো সংবাদ
কেউ পড়ে না ভোরের বেলা, কেউ পড়ে না সাঁঝে!
অষ্টপ্রহর থেকে-থেকেই ভঙ্গ দিয়ে কাজে
ভয়ে সবাই চ্যাঁচায়, বলে—'হায় কি সর্বনাশ,
তিমির মতো তিমির এবার করবে সবটা গ্রাস,
বাঘ বেরোবে পথে-ঘাটে, সাপ ঢুকবে ঘরে,
বিষাক্ত গ্যাস হাওয়ার স্তরে দেখবে বিরাজ করে।
মেঘ দেবে না জল, কাজেই মাঠ দেবে না ধান,
কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হবে না আর গান!
হায় কি সর্বনাশ,
শেয়াল-শকুন কেড়ে খাবে খোকার মুখের গ্রাস।'

বলতে-বলতে সূর্য ওঠেন, বলতে-বলতে চাঁদ
আকাশ কোণে দাঁড়ান এসে, ভাঙে আলোর বাঁধ।
আবার মেঘে বৃষ্টি ঝরে, ফসল ফলে মাঠেঃ
ধুলোর শিশু দুচোখ মুছে টলতে-টলতে হাঁটে॥

ছবি এঁকেছেন॥ পূর্ণেন্দু পত্রী

ধাঁধার পাতা

পাশের বাড়ির ঝুমরুর জন্মদিনে সেদিন নেমন্তন্ন ছিল আমার। খুব হইচই করা গেল। পল্টু আবৃত্তি করল রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা। দীপ্তেন ম্যাজিক দেখাল। কী চমৎকার সব ব্যাপার-স্যাপার। একটা খালি চোঙ থেকে কত রকমের জিনিস যে বার করল দীপ্তেন! সিল্কের রুমাল, কাগজের ফুল, আধ ডজন ঘড়ি—আরও কত কী। লাল রুমালকে নীল করে দিল, নীল রুমালকে সাদা। একটা রুমাল তো চোখের পলকে ছড়িই হয়ে গেল। দীপ্তেনটা দারুণ ম্যাজিক দেখায়।

চন্দন আর ওর বোন সোমা শোনাল রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান। সুন্দর গান করে ওরা। অনুষ্ঠান শেষ হল বাবুয়ার মুকাভিনয় দিয়ে। ওঃ, যা হাসাতে পারে বাবুয়া!

বাড়ি ফিরেই সোজা চলে গেলাম ছোট্‌কার কাছে।

ছোট্‌কাকে ছাদেই পাওয়া গেল। রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে ছোট্‌কা রোজ একটু পায়চারি করে নেয় ছাদে।

আমাকে দেখে ছোট্‌কা বলল, "কী সতুবাবু, ম্যাজিক তো দেখলাম, গানও শুনলাম, মুকাভিনয়ও বেশ জমেছিল, কিন্তু সবার চাইতে ভাল পাউরুটি আর ঝোলাগুড়-পর্বটি বেশ জমেছিল তো?"

বুঝলাম ভোজনপর্বের কথা বলছে ছোট্‌কা। আগের অংশটা তার মানে ছাদ থেকেই দেখা হয়ে গেছে। ঝুমরুদের ছাদ আর আমাদের ছাদ একেবারে পাশাপাশি।

বললাম, "লুচি আর মাংস। জমবে না মানে? তুমি এতক্ষণ ধরে ছাদে কী করছিলে ছোট্‌কা?"

"ধাঁধা বানাচ্ছিলাম!" ছোট্‌কা যেন আমাকে খুশী করার জন্যই বলল।

"কী ধাঁধা? বলো না ছোট্‌কা।" আমার আর তর সইছিল না।

"তোদের নিয়েই একটা ধাঁধা। ধর, এমনই একটা জন্মদিনের ভোজ। ধর, তোরই জন্মদিন। পাঁচ জোড়া ভাইবোন এসেছে। একসঙ্গে তাদের বয়স—মানে ভাইবোনের জোড়ের বয়স—১০, ১৩, ১৭, ২২, ২৩। একবয়সী দুজন নেই। সব থেকে যে ছোট, তার বয়েস ৪, বড়োটির বয়স ১৩। এর মধ্যে একটি ছেলেকে তুই জানিস, যার বয়েস ৭। ভাইবোনের বয়সের জোড় থেকে তোকে বার করতে হবে, যার বয়েস ৭, সেই ছেলেটির বোনের বয়স কত?"

এইটেই এবারের **প্রথম ধাঁধা।**

দ্বিতীয় ধাঁধা :

ফলের উদর কাটলে ফের ফল,
পা ছাড়লে সামান্য সম্বল।
শব্দটি নিরাকার হলে পরে
দিব্য ফুল ফুটত সরোবরে।

তৃতীয় ধাঁধা :

আদিতে অঙ্গ, আদি-মধ্যতে ভর্ৎসনা,
অন্ত্যে পানীয়, পুরো শব্দে আসন-বোনা।

চতুর্থ ধাঁধা :

এমন তিন রাশি খুঁজে বার কর, যাদের যোগফল এবং গুণফল একই হয়।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

(১) বাবর
(২) শিবাজী
(৩) (ক) ১২৩+৪৫−৬৭+৮−৯=১০০

(খ) ১৬ + ২১৪৮/৫৩৭ = ১০০

(গ) ১·২৩৪° + ৯৮·৭৬৫° = ১০০

(৪) পাঁচরকমের স্ট্যাম্প থেকে এক-একবারে তিনটে করে সাজাতে হবে। কেননা, পোস্টকার্ডে ১৫ পয়সার স্ট্যাম্প লাগে।

মনে কর, পাঁচরকম স্ট্যাম্প : ক খ গ ঘ ঙ. তিনটে করে সাজালে দশরকম-ভাবে সাজানো যায়।

কখগ, কখঘ, কখঙ, কগঘ, কগঙ, কঘঙ, খগঘ, খগঙ, খঘঙ, গঘঙ।

যারা একটু উঁচু ক্লাশের অঙ্ক জানে তারা অবশ্য অঙ্কের নিয়মে আরও চটপট করে ফেলতে পারবে।

সত্যসন্ধ

প্রঃ কোন্ প্লেয়ারের শীত করে না?

উঃ উলগা।

প্রঃ শ্যাম থাপার দেওয়া গোলে সবচেয়ে বেশি আঘাত লাগল কার?

উঃ বলের।

প্রঃ কলার খোসায় পা দিলেই লুচি খাওয়াটা জমে কেন?

উঃ আলুর দমের জন্যে।

প্রঃ উচ্চগঙ্গা সমভূমির দক্ষিণে কোন্ অঞ্চল?

উঃ ইহা পরের অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

প্রঃ তেলেভাজা কেন তেলে ভাজা হয়?

উঃ তা না হলে অলুক তৎপুরুষ হবে কি করে?

প্রঃ কি জন্তু সকালে মাছ খায় বিকেলে ঘাস, কখনো চার পায়ে হাঁটে কখনো সাঁতার কাটে?

উঃ দেখিনি কখনো, তুমি দেখেছ?

প্রঃ আর্যদের সঙ্গে মুসলমান-দের কোথায় দেখা হয়েছিল?

উঃ মহম্মেডানের মাঠে।

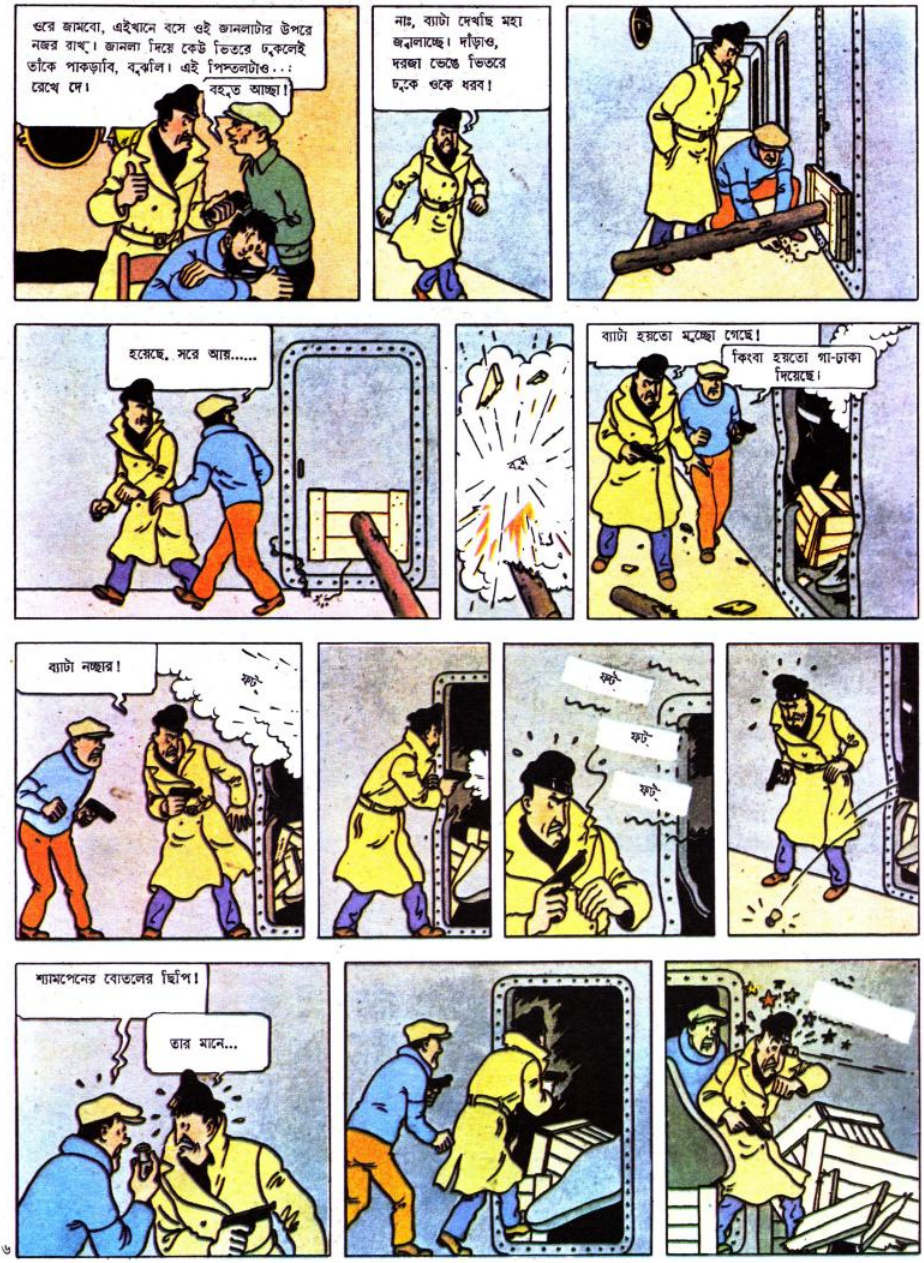
ওরে জামবো, এইখানে বসে ওই জানলাটার উপরে নজর রাখ্। জানলা দিয়ে কেউ ভিতরে ঢুকলেই তাঁকে পাকড়াবি, বুঝলি। এই পিস্তলটাও...: রেখে দে।
বহুত আচ্ছা!
নাঃ, ব্যাটা দেখছি মহা জ্বালাচ্ছে। দাঁড়াও, দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে ওকে ধরব।
হয়েছে, সরে আয়.....
ব্যাটা হয়তো মূর্চ্ছো গেছে!
কিংবা হয়তো গা-ঢাকা দিয়েছে।
ব্যাটা নচ্ছার!
ফট্
ফট্
ফট্
ফট্
শ্যামপেনের বোতলের ছিপি!
তার মানে...

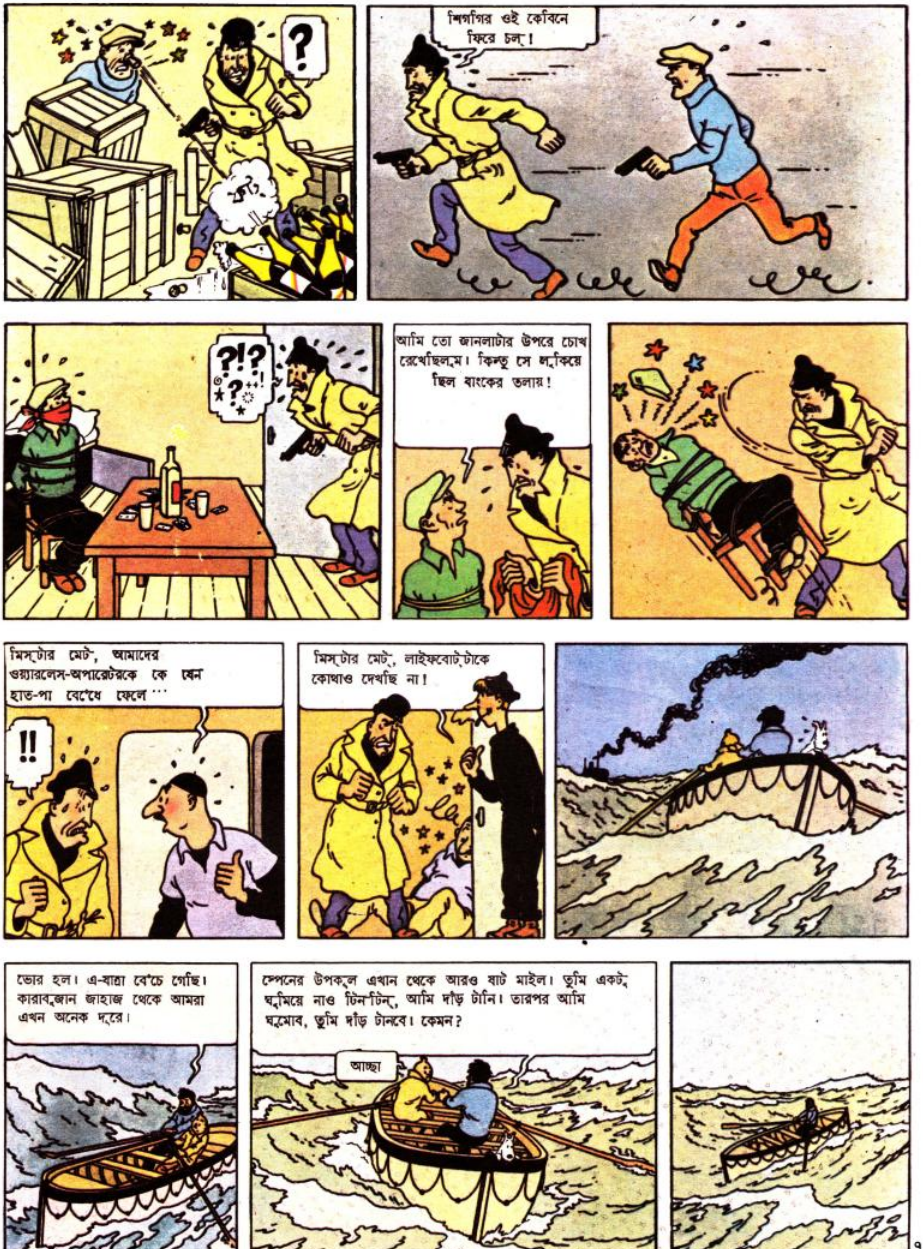
?
শিগগির ওই কেবিনে ফিরে চল্!
?!?
আমি তো জানলাটার উপরে চোখ রেখেছিলুম। কিন্তু সে লুকিয়ে ছিল বাংকের তলায়!
মিস্টার মেট্, আমাদের ওয়্যারলেস-অপারেটরকে কে যেন হাত-পা বেঁধে ফেলে···
!!
মিস্টার মেট্, লাইফবোট্টাকে কোথাও দেখছি না!
ভোর হল। এ-যাত্রা বেঁচে গেছি। কারাবুজান জাহাজ থেকে আমরা এখন অনেক দূরে।
স্পেনের উপকূল এখান থেকে আরও ষাট মাইল। তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও টিন্টিন্, আমি দাঁড় টানি। তারপর আমি ঘুমোব, তুমি দাঁড় টানবে। কেমন?
আচ্ছা

এরপর দশের পাতায়

পিরামিডের শক্তি

চন্দ্রবর্মা

আমাদের নায়কের নাম গোপালভট্ট। সে অদ্ভুত ছেলে। ইচ্ছে হলেই সব জানতে পারে, আবার জানাতেও পারে। তোমাদের সবার মত তারও খুব সুন্দর একটা বাড়ি আছে। বাবা, মা, এক ভাই যদু, বোন বিজয়সুন্দরী এবং ঠাকুরমার সঙ্গে সে থাকে। গম্ভীর চোখে কালো গোল ফ্রেমের চশমা, বয়েস মাত্র বারো, এবং বুদ্ধি প্রখর।

রাস্তায় যেতে যেতে হঠাৎ দেখি, এঁচোড়ে পাকার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বইয়ের স্টলের সামনে ভট্টেশ্বর-চূড়ামণি একমনে কী যেন পড়ছে। দেখা হতেই বললে, "এই যে খুড়ো, একটা খাসা বই পেলাম।"

"কী বই হে ভট্টমহাশয়, এবার আবার নতুন কী শিখলে?"

"মানে...বলছি কি না, সে এক অদ্ভুত শক্তি খুড়ো। পিরামিডের শক্তি!"

শুনে একটু আশ্চর্যই হলাম। কী জানি, বোকা-সোকা মানুষ, কস্মিনকালে নিজের শক্তি-টক্তির কথাই-ভাবিনি, তায় আবার পিরামিডের শক্তি।

জিজ্ঞেস করলুম, "বল দেখি, ভায়া, কী শক্তির কথা বলছ?"

"বলছি। পিরামিড, কিওপস্-এর পিরামিড। নাম নিশ্চয় শুনেছেন। সাতটি বিস্ময়ের মধ্যে প্রধান একটি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছি, ওই যে মিশরদেশের কবরখানি, যার মধ্যে রাজাদের শুকনো মৃতদেহ রয়েছে।"

আমার অশিক্ষিত উত্তর শুনে গোপাল ভট্ট একটু বিরক্তই হল। বললে "কবরখানি! সে কি একটা ব্যাখ্যা হল? আরে মশায়, পিরামিডের মামীর কথা শুনেছেন তো?"

"তা শুনেছি হয়ত; মনে হচ্ছে কোথায় যেন দেখেওছি। এই শহরেই কোথায় যেন।"

আমি আমতা আমতা করতে লাগলুম।

গোপাল অধৈর্য হয়ে বললে, "কী মুশকিল্। কলকাতার মিউজিয়ামের সর্বপ্রথম ও শেষ দ্রষ্টব্য জিনিস একেবারে প্রবেশদ্বারের সম্মুখে কাঠের পুতুলের মত শুয়ে রয়েছে, তবু আপনার মনে পড়ছে না?"

"তা বটে, এবার মনে পড়েছে। বুঝলে না, ভট্টমহাশয়, সেই গিয়েছিলুম পাঁচ বছর বয়সে। তারপর আর ও-মুখো হইনি।"

মস্ত পণ্ডিতের মত মাথা নেড়ে গোপাল ভট্ট বোঝাতে লাগল, "হাজার-হাজার বছর ধরে মিশরদেশের বহু রাজা, গুণীমানী ব্যক্তিদের মৃতদেহকে বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রথায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত সেগুলো অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। যেমন ধরুন বিখ্যাত ফ্যারো টুটেনকামেনের মামী। সে থাক্ গে, আজ একটা নতুন খবর জানলুম। পিরামিডের নাকি অত্যাশ্চর্য শক্তি আছে। শক্তি বলতে আপনি আবার ফোরম্যান, মহম্মদ আলির শক্তির কথা বুঝবেন না যেন। এই পিরামিডের শক্তি এতই অদ্ভুত যে, তার আয়ত্তে পড়লে মৃত জীব-জন্তু, কীটপতঙ্গ, পোকামাকড় কখনই পচে না, কেবল শুকিয়ে যায়। এমনকী, পিরামিডের মধ্যে বেশী চলা-ফেরা করলেও নাকি দেহের অনেক জীবাণু মরে যায়। তবে কিনা দেহের যেমন ক্ষতিকর জীবাণু আছে তেমনি ভাল জীবাণুও তো কিছু-কিছু আছে। অনেকে তাই মনে করেন, পিরামিডে বহুদিন কাটালে নাকি শরীরের ক্ষতিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়। অপরদিকে, মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তির বৃদ্ধি ঘটে এবং বহু ক্ষেত্রে ভোঁতা অস্ত্র ধারালো হয়ে ওঠে!"

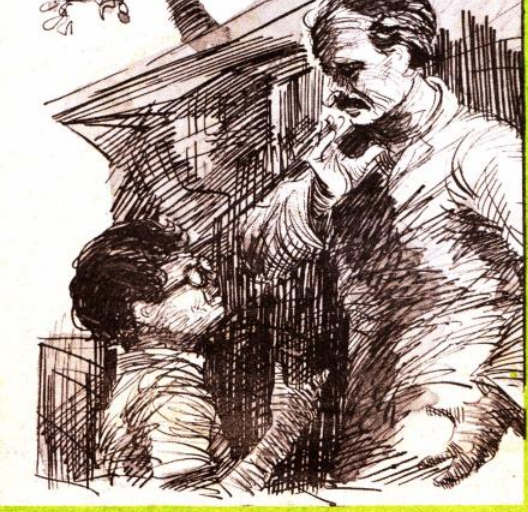

শুনে অবাক হয়ে বললুম, "বলছ কী হে, অমন শক্তির কথা তো জানতুম না।"

গোপাল সহাস্যে সবজান্তার মত বললে, "তাই তো ভাবলুম, খুড়ো, আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। সত্তর বছর আগে এক ফরাসী গবেষক সেই বিখ্যাত পিরামিডে সংরক্ষিত মামীদের দেখে অবাক হন। কেমন করে মামীদের রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল, তাই নিয়ে তিনি অনেক ভাবনাচিন্তা করেন। অবশেষে তাঁর মনে হল, হয়ত পিরামিডের বিশেষ আকৃতিই কোন গুপ্তশক্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করে।"

"আকৃতি! তা সত্যি বটে। নিঃসন্দেহে অদ্ভুত বলা যেতে পারে। তা বলো বলো, গোপালভট্ট, তোমার ফরাসী সাহেবের বেশ খাসা বুদ্ধি ছিল বলতে হয়।"

গোপাল আবার আরম্ভ করলে, "তারপর সেই ফরাসী গবেষক একটা ছোট্ট মডেল তৈরি করেন, প্রকৃত পিরামিডের আপেক্ষিক মাপ বজায় রেখে। মডেল তৈরি

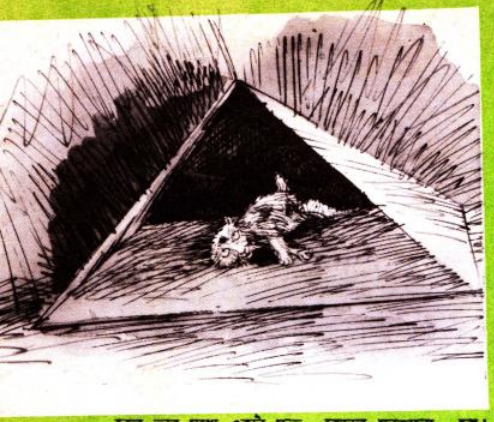

হলে তার মধ্যে একটা মৃত বেড়াল ঢোকানো হয়। আশ্চর্যের বিষয়, সেই বেড়ালছানাটি না পচে গিয়ে কেবল শুকিয়ে মামীতে পরিণত হল।"

"ওহে গোপালভট্ট, এ যে সাংঘাতিক কথা শোনাচ্ছ তুমি। তারপর, তারপর কী হল বল দেখি," আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম।

একটু ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে, চশমাটাকে নাকের ওপর ঠেলে দিয়ে বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি। তারপর বহুদিন চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ পঞ্চাশ বছর পরে কারেল ড্রবাল নামে এক রেডিও-এনজিনিয়ার আবিষ্কার করলেন যে, পিরামিডের মডেলের মধ্যে দাড়ি কামাবার ব্লেড রাখলে তা আপনা-আপনি আবার ধারালো হয়ে ওঠে। তরপর আর কী, সোজা ব্যবসা। ড্রবাল সাহেব এক নতুন ব্লেড ধার করার যন্ত্র বাজারে চালু করলেন, নাম দিলেন 'পিরামিড্ রেজর ব্লেড শার্পনার'। ১৯৭০ সালে খবর গিয়ে পৌঁছল আমেরিকায় এবং কানাডায়। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিনী প্রথা অনুযায়ী চালু হল আরও বড় ব্যবসা। চেষ্টা করলে হয়ত নিউমার্কেটের কোনো স্মাগ্‌লারের কাছে সেই যন্ত্রের হদিশ পেতে পারেন।"

আমি ব্যাপারটা শুনে সত্যিই খুব চমৎকৃত হলুম। ভটকে জিজ্ঞেস করলুম, "আচ্ছা, বাবা, শক্তিটা আসছে কোথা থেকে বল তো। দৈবিক ব্যাপার-ট্যাপার নাকি?"

"কী যন্ত্রণা, আপনারা সবেতেই দৈবকে টেনে আনেন কেন বলুন তো? মিশরের বৈজ্ঞানিকরা যদি হাজার-হাজার বছর আগেও সেই শক্তি সম্বন্ধে অবগত থাকতে পারেন, এবং প্রয়োগও করে থাকেন, তবে তার মধ্যে পার্থিব নিশ্চয় কিছু আছে, এখনও পুরোপুরি উত্তর মেলেনি। অনেকে মনে করেন 'অরগন' নামে এক প্রকারের শক্তি বা এনার্জি আছে। সেই অরগনের দরুনই নাকি আকাশকে নীল দেখায়, তারার দল মিট্‌মিট করে। মিশরদেশের বৈজ্ঞানিকরা সেই অরগন শক্তি সম্বন্ধে হয়ত অবগত ছিলেন এবং সম্ভবত সেই শক্তির সাহায্যেই ও'রা বড় বড় পাথর মরুভূমির ওপর দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতেন পিরামিড তৈরির কাজে। সে-যুগেও তাঁরা জানতেন যে, পিরামিডের বিশেষ আকৃতি সেই আশ্চর্য শক্তিকে ধরে রাখতে ও বাড়িয়ে তুলতে মদত দেয়। কয়েক বছর ধরে এ নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। দেখা যাক্ কোথাকার জল শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।"

"আচ্ছা ভট্টেশ্বর, এত পড়াশুনো না-করে একটা পিরামিডের মডেল তৈরি করে পরীক্ষা করে দেখলেই তো হয়," আমি বললুম।

জবাব এল সঙ্গে সঙ্গে। "আমি কি আপনার বলার অপেক্ষায় ছিলুম? দেখুন, সেইজন্যেই এই বই কিনছিলুম। ভাবছি ইশকুলের পর বাড়ি ফিরে একটা পিরামিডের মডেল তৈরি করব। মাপ তো সহজই মনে হচ্ছে। বড়, ছোটো সব রকমই হয়। প্রথমটা চারটে কার্ড-বোর্ডের ত্রিভুজ কাটতে হবে। প্রতোকটি ত্রিভুজ-এর উচ্চতা হবে পার্শ্বের অর্ধেক। মাপের হেরফের হলে চলবে না। তারপর চারটে ত্রিভুজের ধারগুলো আঠা দিয়ে জুড়তে হবে। অবশ্য জোড়ার আগে আপনার মৃত আরশোলা, ব্যাঙ, টিক্‌টিকি কিংবা দাড়ি কামাবার ব্লেডটি সাবধানে পিরামিডের ঠিক মাঝখানে যেমন করে হোক রাখতে হবে।"

"নড়ে যায় যদি?" আমি প্রশ্ন করলুম।

"তবে সুতো দিয়ে আটকে দেবেন।" সহজ সমাধান জানালো গোপাল। তারপর সে হঠাৎ হেসে উঠল। বলল, "খুড়ো, একটা জব্বর ফন্দি এঁটেছি। চলুন আমরা একটা বেশ বড়সড় পিরামিড গড়ি এবং তার মধ্যিখানে আমাদের বাড়ির যদুটাকে বসিয়ে দিই। ছেলেটা আমার কোনো কথাই শোনে না। পিরামিডের মধ্যে বসিয়ে দিলে যদি ওর কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি বাড়ে।"

ছবি এঁকেছেন ॥ মদন সরকার

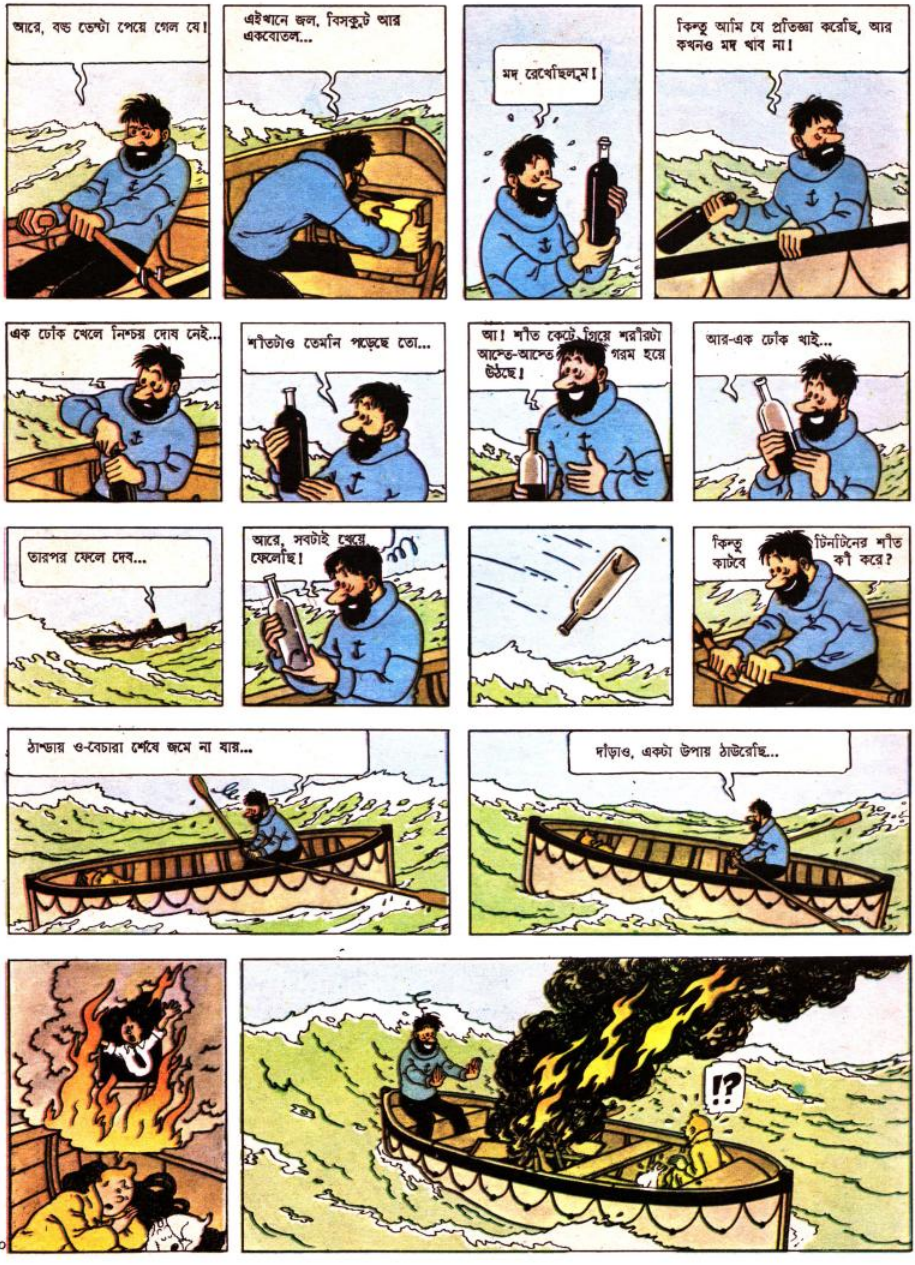

আরে, বড্ড তেষ্টা পেয়ে গেল যে!
এইখানে জল, বিসকুট আর একবোতল...
মদ রেখেছিলুম!
কিন্তু আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি, আর কখনও মদ খাব না!
এক ঢোঁক খেলে নিশ্চয় দোষ নেই...
শীতটাও তেমনি পড়েছে তো...
আঃ! শীত কেটে গিয়ে শরীরটা আস্তে-আস্তে গরম হয়ে উঠছে!
আর-এক ঢোঁক খাই...
তারপর ফেলে দেব...
আরে, সবটাই খেয়ে ফেলেছি!
কিন্তু টিনটিনের শীত কাটবে কী করে?
ঠাণ্ডায় ও-বেচারা শেষে জমে না যায়...
দাঁড়াও, একটা উপায় ঠাউরেছি...
!?

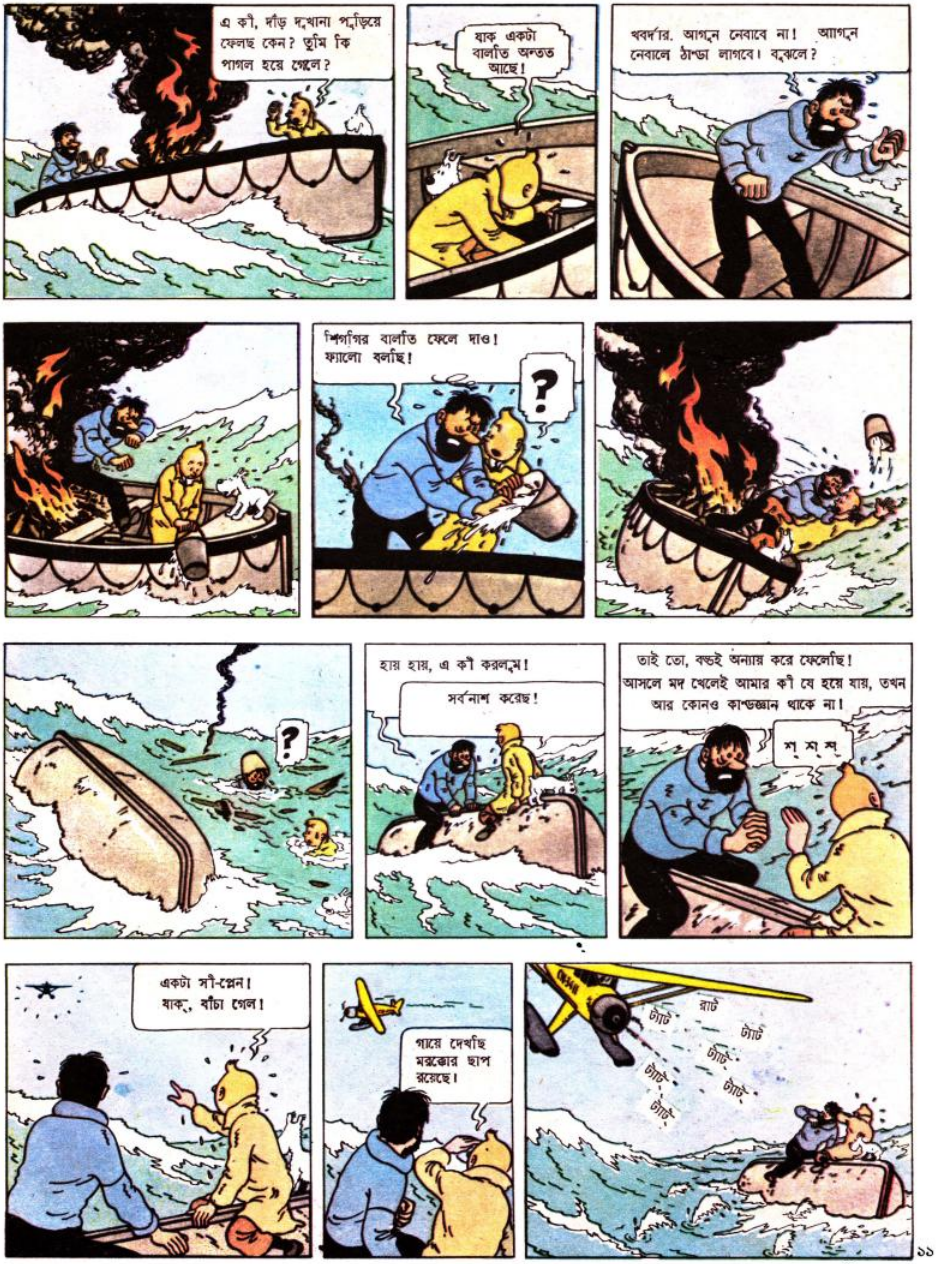

এরপর আগামী সংখ্যায়

চোরে ডাকাতে

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সে আমলে আমাদের পরগনায় বিখ্যাত চোর ছিল সিধু। তার হাত খুব সাফ ছিল, মাথা ছিল ঠান্ডা, আর তুখোর বুদ্ধি। দিনের বেলা সিধু গৃহস্থের মতো চালচলন বজায় রাখত, আমাদের বাড়িতেও বেড়াতে টেড়াতে আসত সে। আর পাঁচজনের মতোই ঠাকুমা তাকেও ফল-টল খাওয়াতেন, মুড়ি মেখে দিতেন। কেবল সে চলে যাওয়ার পর ঠাকুমা গেলাশ বাটি গুনে দেখতেন সব ঠিকঠাক আছে কিনা। সিধু সব বাড়িতে যেত খবর করতে, কার বাড়িতে নতুন লোক এল, কী নতুন কাপড়চোপড় এল দেল দুর্গোৎসবে, কোন্ বাড়িতে টাকা-পয়সার আমদানি হচ্ছে, ইত্যাদি। খবর বুঝে রাত-বিরেতে হানা দিত সেই বাড়িতে। এমন সব মন্ত্র জানা ছিল তার যে, সেই মন্ত্রের জোরে বাড়ির সবাই নিঃসাড়ে ঘুমোতো, সিধু হাসতে হাসতে চুরি করে নিয়ে যেত সব। এমন কী যাওয়ার আগে গেরস্তর ঘরে বসে দু দন্ড জিরিয়ে তামাক টামাক খেয়ে যেত। আমরা ছেলেবেলায় যখন তাকে দেখেছি তখন সে বেশ বুড়ো। পরনে ফরাসডাঙার ধুতি, গিলে-করা পাঞ্জাবি, পায়ে নিউকাট, মুখে পান, আর গলায় গান। বুড়ো বয়সেও বেশ শৌখিন ছিল সে। চার আঙুলে চারটে করে আংটি পরত, বাজার করতে গিয়ে দরাদরি করত না। চুরি করে প্রচুর পয়সা করেছিল সে। বাড়িতে দশ-বারোটা গরু, সাত-আটজন ঝি-চাকর, জুড়ি-গাড়ি সবই ছিল তার। বুড়ো বয়সে তার ভীমরতি হয়েছিল খানিকটা। তখন তার চোখে ছানি আসছে, বাত-ব্যাধিতেও কষ্ট পায়। খুব দরকার না পড়লে চুরি করতে যেত না। এদিকে তার ছোটো মেয়ে বিবাহযোগ্যা হয়েছে। একটা ভাল সম্বন্ধও পেয়ে গেল। মেয়ের বিয়ে, তার খরচ কম নয়। তার বৌ তখন তাকে প্রায়ই খোঁচাত, "মেয়ের বিয়ে আষাঢ়ে, তোমার তো গরজই নেই দেখছি, অত বড় ব্যাপার, তার খরচাপাতি আসবে কোত্থেকে? রাতের দিকে একটু-আধটু বেরোলে তো হয়।" সিধু তখন তার কাঁকালের ব্যথার কথা বলত, চোখের ছানির কথা বলত, কিন্তু তার বৌ সে-সব শুনত না। শোনা যায়, বুড়ো বয়সে সিধুর কিছু ভূতের ভয়ও হয়েছিল। নিশুত রাতে বেরোতে সাহস পেত না।

আমাদের পরগনায় আর একজন বিখ্যাত লোক ছিল। তার নাম হালিম। লোকে বলত হালুম মিঞা। তা হালিম ছিল সাঙ্ঘাতিক ডাকাত। যেমন তার বিরাট চেহারা, তেমনি তার সাহস। যে-বাড়িতে ডাকাতি করবে, সে-বাড়িতে সাতদিন আগে গিয়ে তার সাকরেদ চিঠি দিয়ে আসত যে, অমুক দিন হালিম সে-বাড়িতে ডাকাতি করতে আসবে। সে-আমলে পূর্ববঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে দারোগা পুলিশ খুব বেশী ছিল না। তাছাড়া খালবিল জঙ্গলের দেশ বলে অধিকাংশ জায়গাই ছিল দুর্গম। সে-সব জায়গায় চোর-ডাকাতদের ভারী সুবিধে। হালিম বা হালুম মিঞাকে তাই কেউ কখনো জব্দ করতে পারেনি। সে ছিল দারুণ লাঠিয়াল, অসম্ভব সাহসী। দরকার না পড়লে সে খুন-টুন করত না। জমিদার বা ধনীরা সাধারণত হালিম মিঞা ডাকাতি করতে এলে খাতির-টাতির করত। শোনা যায়, হালিম যে-বাড়িতে ডাকাতি করতে যেত, সে-বাড়ি আগে থেকেই বিয়ে-বাড়ির মতো সাজানো হত, রোশনাই দেওয়া হত, ভাল খাবারের বন্দোবস্ত থাকত। হালিম উপস্থিত হলে বাড়ির মালিক হাতজোড় করে 'আসুন বসুন' করত। হালিম বিনা বাধায় ডাকাতি করে চলে আসত, কিংবা ঠিক ডাকাতি তাকে করতে হত না, বাড়ির লোকেরা তাকে সিন্দুকের চাবি-টাবি খুলে সব গুনেগেঁথে দিয়ে দিত। কিন্তু সকলের তো দিন সমান যায় না। আমাদের ছেলেবয়সে সেই কিংবদন্তীর ডাকাত হালিমও বুড়ো হয়েছে। গোরুথানের কাছে তার বেশ বড় বাড়ি। তারও দাসী চাকর, ধানের মরাই, জোত-জমি-গরু সবই আছে। আমরা হালিমকে দেখতাম কানে আতরের তুলো গুঁজে, চোখে সুর্মা দিয়ে, চমৎকার চেক-কাটা সিল্কের লুঙ্গি আর মখমলের পাঞ্জাবি পরে জমিদারের পুকুরে ছিপে মাছ মারছে। খুব গম্ভীর ছিল সে, চোখ দুখানা সবসময়ে লাল টকটকে। ডাকাতি করা তখন ছেড়েই দিয়েছে, তবে শিক্ষানবিশ ডাকাতরা তার কাছে তালিম নিতে আসত।

সিধুর কথা যা বলছিলাম। বৌয়ের তাড়নায় অবশেষে সে একদিন রাতে চুরি করতে বেরোলো। চোখের ছানির

জন্য রাস্তাঘাট ভাল ঠাহর হয় না, তাই সঙ্গে হ্যারিকেন নিল। একা যেতে ভূতের ভয়, তাই একজন চাকরকেও ডেকে নিল সঙ্গে। রাস্তায় সাপ-খোপের গায়ে পা পড়তে পারে ভেবে হাততালি দিয়ে দিয়ে হাঁটতে লাগল। আর ভূতপ্রেত তাড়ানোর জন্য তারস্বরে রামনাম করতে লাগল। সেই হাততালি আর রামনামের চোটে এত বিকট শব্দ হচ্ছিল যে, রাস্তার দুপাশের বাড়িঘরে লোকজনের ঘুম ভেঙে যেতে লাগল। তারা সব উঁকি মেরে দেখছে, ব্যাপার-খানা কী! অনেকেরই ধারণা হল, সিধু চোর ধার্মিক হয়ে গেছে, তাই রাত থাকতে উঠে ঠাকুরের নাম নিতে নিতে প্রাতঃস্নান করতে যাচ্ছে নদীতে। এদিকে সিধুর হল বিপদ, যে-বাড়িতেই ঢুকতে যায় সে-বাড়িতেই দেখে গৃহস্থ সজাগ রয়েছে। ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গেল সে। কত ঘুমপাড়ানী মন্ত্র পাঠ করল, কিন্তু বুড়ো বয়সে মন্ত্রের জোরও কমে এসেছে, তেমন কাজ হয় না।

ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গোর-স্থানের কাছ-বরাবর এসে এক গাছ-তলায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছিল সিধু। খুব ঠাহর করে সম্মুখপানে দেখে বলল, "ঐ মস্ত বাড়ি, ওটা কার রে?"

চাকর উত্তর দিল, "ও হালুম মিঞার বাড়ি।"

"বটে বটে!" বলে খুব খুশির ভাব দেখাল সিধু, "তা হালিম দুপয়সা করেছে বটে। এতকাল তো খেয়াল হয়নি।"

এই বলে সিধু সিঁদকাঠি বের করল।

পরদিন গঞ্জে হৈ-চৈ পড়ে গেল। হালুম মিঞার বাড়িতে মস্ত চুরি হয়ে গেছে। সকালে হালিমের বৌ পা ছড়িয়ে পাড়া জানান দিয়ে কাঁদতে বসেছে—"ওগো, আমার কী হল গো? আমার সব চেঁছে পুঁছে নিয়ে গেছে গো। বলি ও বুড়ো হালিম, তোর শরম নেই? যার দাপে বাঘে গরুতে এক-ঘাটে জল খেত তার বাড়িতে চুরি? বলি ও মুখপোড়া হালিমবুড়ো, সাতসকালে গাঁজা টানতে বসেছিস। কচু গাছের সঙ্গে দাঁড় বেঁধে ফাঁসি যা, থুথু ফেলে তাতে ডুবে মর..."

দাওয়ায় বসে গাঁজা খেতে খেতে হালিম কেবল রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে তার বিবিকে ধমক দিয়ে বলে, "চুপ র, চুপ র বাঁদী। যে ব্যাটা চুরি করেছে তার গর্দানের জিম্মা আমার। দেখিস।"

তা শুনে বিবি আরো ডুকরে কেঁদে ওঠে।

হালিম দুটো কাজ করল। সিধুর নামে তিন ক্রোশ দূরের থানায় গিয়ে একটা নালিশ ঠুকে দিয়ে এল, আর সিধুর মেয়ের বিয়ের ঠিক সাত দিন আগে একটা চিঠি পাঠাল তার কাছে, "তোমার কন্যার বিবাহের রাত্রে আমি সদলবলে উপস্থিত হইতেছি। আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিও..." ইত্যাদি।

চিঠি পেয়ে সিধু বলল, "ফুঃ।"

তারপর সেও গিয়ে তিন ক্রোশ দূরের থানায় দারোগাবাবুকে মুর্গী আর মাছ ভেট দিয়ে মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন করে এসে দাওয়ায় বসে ফিক ফিক করে হাসতে আর তামাক খেতে লাগল।

সিধুর মেয়ের বিয়েতে আমাদেরও নেমন্তন্ন ছিল, ছোটোকাকা সমেত আমরা সব ঝেঁটিয়ে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, হালুম মিঞা ডাকাতি করতে আসবে শুনে যাদের নেমন্তন্ন হয়নি তারাও সব এসেছে গঞ্জ সাফ্ করে। বিয়েবাড়ি গিসগিস করছে লোকে। দারোগাবাবুও এসে গেছেন। সিধু তাঁকে বিবাহ-বাসরের মাঝখানে বরাসনে বসিয়ে দিয়েছে আর বর তার পাশে একটা মোড়ায় বসে নিজের হাতে হাতপাখার বাতাস খেতে খেতে ঘামছে।

তখনকার নিমন্ত্রণে চার পাঁচ রকমের ডাল খাওয়ান হত, তারপর মাছ মাংস, দৈ মিষ্টি বা পায়েস দেওয়া হত। আমরা সবে তিন নম্বর ডাল খেয়ে চার নম্বর ডালের জন্য তৈরী হচ্ছি এমন সময়ে উত্তরের মাঠ থেকে "রে রে" চিৎকার উঠল আর মশাল দেখা গেল। পাত ছেড়ে আমরা সব ডাকাতি দেখতে দৌড়ে গেলাম।

কী করুণ দৃশ্য! ষাট সত্তরজন সাকরেদ নিয়ে হালিম এসে গেছে। সকলের হাতেই বিশাল লাঠি, বল্লম, দা, টাঙ্গি। কপালে সিঁদুরের টিপ। খালি গা, মালকোঁচা করে ধুতি পরা। কিন্তু সব কজনই বুড়োসুড়ো মানুষ। এতদূর জোর পায়ে এসে আর হাল্লা-চিল্লা করে সকলেরই দম ফুরিয়ে গেছে। হালিমের হাঁপির টান উঠেছে, তাই সিধু তাকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে বারান্দায় বসাল। কয়েকজন ডাকাত উবু হয়ে বসে কাসতে কাসতে বুকের শ্লেষ্মা তুলছে। একজনকে দেখলাম, হাতের ভারী কুড়ুলটা আর বইতে না পেরে একজন বরযাত্রীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজের ভেরে-যাওয়া হাতটাকে ঝেড়েঝুড়ে ঠিকঠাক করে নিচ্ছে।

সিধু অনেকক্ষণ হালিমের বুক মালিশ করে দেওয়ার পর হালিমের হাঁপির টানটা কমল। তখন হাতের খাঁড়াটা তুলে নিয়ে বলল, "এবার কাজের কথা হোক।"

সিধু হাতজোড় করে বলল, "তোমার মান মর্যাদা ভুলে যাইনি হে। এই নাও সিন্দুকের চাবি, দরজা টরজা সব খোলা আছে। চলে যাও ভিতর-বাড়িতে।"

তো তাই হল। হুঙ্কার দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল হালিম, সঙ্গে সঙ্গে তার দলবলও হুঙ্কার দিল। অবশ্য হুঙ্কারের সঙ্গে-সঙ্গেই খক্ খক্ করে কাসিও শুরু হয়ে গেল। কিন্তু বেশ দাপের সঙ্গেই হালিম ভিতরে ঢুকে লুটপাট করতে লাগল। নিজের বাড়ির যেসব জিনিস চুরি গিয়েছিল সে সবই উদ্ধার করল হালিম। সিধু আগাগোড়া সঙ্গে রইল হাতজোড় করে। হালিম কোনো জিনিস নিতে ভুল করলে সিধু আবার সেটা দেখিয়ে দেয়, "ঐ কাঁসার বাটিটা নিলে না! বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে নাকি, ঐ দেয়ালঘড়িটা যে তোমার, চিনতে পারছো না?"

এইভাবে ডাকাতি নির্বিঘ্নে এবং সাফল্যের সঙ্গে শেষ হল। সারাক্ষণ দারোগাবাবু পা ছড়িয়ে বসে তামাক টানলেন। সবাই তাঁর হাফপ্যান্টের নীচে বিশাল মোটা পা, মোটা বেল্ট আর ক্রসবেল্টে বেঁধে-রাখা প্রকাণ্ড ভুঁড়ি এবং চোমড়ানো গোঁফের খুব তারিফ করতে লাগল। তিনি কাউকে গ্রাহ্য করলেন না। বর বেচারা নিজেকে বাতাস করতে করতে ক্লান্ত হয়ে বসে ঢুলছে। বরযাত্রী সমেত সবাই ডাকাতি দেখছে ঘুরে ঘুরে।

ব্যাপারটা শেষ হলে হালিম আর সিধু এসে দারোগাবাবুর সামনে করজোড়ে দাঁড়াল। দারোগাবাবু হুঙ্কার দিলেন, "ঘটনাটা কী হল বুঝিয়ে বল্। এই বুড়োবয়সে চুরি ডাকাতি করতে যাস, একদিন মরবি।"

সিধু কাঁচুমাচু হয়ে বলে, "বড়বাবু, চুরি কি আর নিজের ইচ্ছায় করতে গেলাম! বৌয়ের কাছে ইজ্জৎ থাকে না, সে-ই ঠেলেঠুলে পাঠায়।"

হালিমও বলল, "আমারও ঐ কথা।"

দারোগাবাবু হাতের নল ফেলে খুব হাসলেন। তাঁর হাসিরও সবাই প্রশংসা করল।

তারপর বারান্দায় ঠাঁই করে হালিমের দলকে খেতে বসানো হল। হালিমের অবস্থা ভাল, কিন্তু তার সাকরেদরা সব হাঘরে। ডাল আর বেগুনভাজা দিয়েই তারা পাত লোপাট করতে লাগল।

সেই দেখে আমাদেরও মনে পড়ল, আমাদের পাতে এবার চার-নম্বর ডাল পড়বার কথা। আমরা সব দৌড়োদৌড়ি করে ফিরে এলাম খাওয়ার জায়গায়। এবং তারপরই গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। অর্ধেক খেয়ে উঠে গেছি, ফিরে

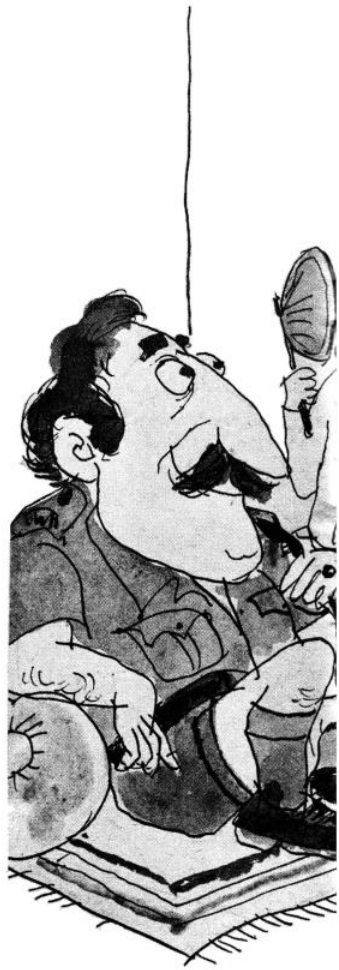

এসে হুটপাট করে বসে পড়বার কিছুক্ষণ পরেই সবাই টের পেতে লাগলাম, পাতের গণ্ডগোল হয়ে গেছে। কে কার পাতে বসেছি তার ঠিক পাচ্ছি না। যেমন, আমার ডানপাশে ছোটোকাকা বসেছিল, বাঁয়ে সুবল। পাতে দেড়খানা বেগুনভাজা ছিল, মুড়িঘণ্টের একটা কানকো। এখন দেখছি, ছোটোকাকা উল্টোদিকের সারিতে বসে আছে, বাঁ পাশে বিপিন পণ্ডিত, পাতে আধখানা মোটে বেগুন-ভাজা, মুড়িঘণ্টের কানকোটা নেই, একটা পোটকা পড়ে আছে। সবাই চেঁচামেচি করতে লাগল, "এই, তুই আমার পাতে বসেছিস চোর কোথাকার...ও মশাই, আপনি তো আমার বাঁ ধারে ছিলেন...এ কি, আমার কুমড়োভাজা কোথায় গেল..." ইত্যাদি।

তবু খাওয়াটা সেদিন খুব জমেছিল।

ছবি এঁকেছেন ॥ সুধীর মৈত্র

ম্যাজিকের মতো

পার্থসারথি চক্রবর্তী

রবিবার দিন সকালবেলায় হাসুবাবু নানারকম মজার ভেলকিবাজী দেখিয়ে বাবুন, মিঠুন, ডিংকু, লবু-কুশু ওদের সবাইকে অবাক করে দিচ্ছিল। হাসুবাবু এবার পকেট থেকে একটা দশপয়সা বের করে সেটা একটা বড় প্লেটের উপর রাখল। তারপর ঐ প্লেটে বেশ কিছুটা জল ঢেলে পয়সাটাকে ঢেকে দিয়ে বলল—হাতের একটা আঙুলও না ভিজিয়ে তোমরা কি কেউ ঐ পয়সাটা তুলে আনতে পারো?

ছোটর দল অবাক হয়ে এ ওর মুখের দিকে চাইছে এমন সময় ডিংকু এগিয়ে এসে বলল, "হ্যাঁ, আমি এ কাজটা করতে পারি, তবে এজন্যে আমার কতকগুলো জিনিস চাই, সেগুলো নিয়ে আমি এক্ষুনি আসছি।" এই বলে এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর থেকে সে কয়েকটি সাধারণ জিনিস নিয়ে এল। এগুলি হচ্ছে—একটা কাচের গেলাস, একটা কর্ক আর একটা দেশলাইয়ের বাক্স।

ডিংকু এবার ঐ কর্কের মধ্যে কয়েকটা দেশলাইয়ের কাঠি বিঁধিয়ে সেটাকে প্লেটের জলে ভাসিয়ে দিল। তারপর ডানহাতে খালি গেলাসটাকে উল্টো করে ধরে, বাঁ হাত দিয়ে ঐ কর্কের কাঠিগুলিকে জ্বালিয়ে দিল। এরপর কর্কে বিদ্ধ জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিগুলোর উপরে গেলাসটাকে বসিয়ে দিতেই ওরা সবাই অবাক হয়ে দেখল প্লেটের সব জল গেলাসের মধ্যে চলে গিয়েছে।

ডিংকু দুচার মিনিট অপেক্ষা করে, পয়সাটা আপনা থেকেই শুকিয়ে যাবার পর, ওটাকে খুব সহজেই প্লেট থেকে তুলে নিতেই ছোটরা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

গেলাসের মধ্যে ম্যাজিকের মতো সব জল ঢুকে পড়ল কেন বলো তো? অনেক অনেক কাল আগে লোকে ভুল করে মনে করত যে, গেলাসের মধ্যেকার অক্সিজেন পুড়ে যাওয়ার ফলেই তার ভিতরের গ্যাসের আয়তন কমে যায়, তাই গেলাসের মধ্যে জল ঢুকে পড়ে। আসলে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালানোর জন্যে ভিতরের বাতাস গরম হয়ে চাপ বাড়িয়ে দেয়। খানিকটা বাতাস বেরিয়েও যেতে পারে। বাইরের চাপে তখন প্লেটের জল খুব সহজেই গেলাসের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

জাদুঘর

দেখলে মনে হয় চোর-চোর খেলা চলছে। কিংবা হা-ডু-ডু। কিন্তু মোটেই তা নয়। আসলে যা হচ্ছে তা এক খুনোখুনি কাণ্ড। তিনজন লোক মিলে নিরীহ একজন মানুষকে মেরে ফেলছে। যাকে বলে—দিনে-দুপুরে খুন। বেচারা এতক্ষণে নিশ্চয় মরেই গেছে।

একজন নয়, দু'জন নয়, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ মরেছে ওদের হাতে। ওরা নামকরা খুনীর দল। ওরা ইতিহাসের ঠগী। অন্য নাম—ফাঁসুড়ে। এমন নিষ্ঠুর খুনী বুঝি আর হয় না! যে-লোকটা পথিকের পা চেপে ধরে আছে সে—চামোসি। হাত ধরে আছে যে, সে—সামসিয়া। আর গলায় ফাঁস পরাচ্ছে যে, তাকে বলা হতো—ভুকোত। কাজ শেষ হয়ে গেলেই সে চেঁচিয়ে উঠবে—বাজিত খান! অর্থাৎ —খতম। সঙ্গে সঙ্গে দলের অন্যরা এসে লোকটিকে কবর দিতে নিয়ে চলে যাবে। তারপর কবরে বসে সকলে মিলে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া। নতুন শিকারের সন্ধানে আবার বেরিয়ে পড়া।

বোমা পিস্তল নেই, ছুরি বা তলোয়ারও নেই। হাতিয়ার বলতে ওদের কোমরে থাকতো বেশ বড় মাপের একখানা হলুদ রুমাল। তার এক কোণে বাঁধা সিঁদুর-মাখানো একটি টাকা। নয়তো তামার একটা ডবল-পয়সা। তা-ই দিয়ে নিরীহ পথিকের গলায় হঠাৎ পেছন থেকে ফাঁস পরিয়ে দিত ওরা। তার আগে ভুলিয়ে ভালিয়ে তার সঙ্গে দিব্যি বন্ধুত্ব জমিয়ে নিত। তারপর সুযোগ বুঝে সর্দার এক সময় হাঁক দিত—তামাকু লাও! সঙ্গে সঙ্গে দলের খুনীরা ঝাঁপিয়ে পড়তো পথিকের ওপর। চোখের নিমেষে সব শেষ।

মানুষ খুন করতো ওরা অবশ্য পয়সার লোভে। তবে সঙ্গে কারও পয়সা কম থাকলেও সে ছাড়া পেত না। ঠগীরা বিশ্বাস করতো, মা-কালীর আদেশে খুন করাই তাদের কাজ। সেটাই তাদের ধর্ম। ওদের ধর্ম আলাদা। রীতি নীতি আলাদা। ভাষাও আলাদা। কথাবার্তা বলতো ওরা এক সাংকেতিক ভাষায়। ওদের ভাষায় ছোট ছেলে—জনকুলা বা খোনতুরা। বাচ্চা মেয়ে—জনকুলি বা খোনতুরি। ঘোড়া-বুগিলা। গরু—রানকুরি। টাকা—কারবা! কখনও-কখনও অবশ্য ওরা কোনও কোনও মানুষকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিত। কিন্তু সে দয়া করে নয়। হঠাৎ পেঁচা ডেকে উঠেছিল, তা-ই। ওদের কানে কাকের ডাক শুভ, পেঁচার ডাক অশুভ।

শত শত বছর ধরে দিব্যি নিঃশব্দে খুনের কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল ঠগীর দল। শত শত দল। হাজার হাজার ঠগী। গোটা ভারত জুড়ে থেকে-থেকেই হুকুম —তামাকু লাও! কিন্তু একদিন থামতে হলো তাদের। বাদ সাধলেন এক সাহেব। তিনি—স্লীম্যান। দিনের পর দিন চেষ্টা করে ঠগীদের তিনি নির্মূল করলেন। সে এক কঠিন লড়াই। এদেশে বড়লাট তখন ক্যানিং। অনেক ঠগী ধরা পড়ল। কারও ফাঁসি হলো। কারও জেল। দেশের মানুষ নিশ্চিন্ত হলো। স্লীম্যানের নামে মধ্যপ্রদেশে একটা গাঁয়ের নাম হয়ে গিয়েছিল—স্লীমানাবাদ। সে-গ্রাম আজও রয়েছে। আর রয়েছে এই চীনেমাটির পুতুল-ঠগীর দল। এরা আজ আর খুন করতে পারে না বটে, তবু দেখলে কিন্তু এখনও গা ছমছম করে।

শ্রীপান্থ

শেখর বসু

ভাগ্যিস ইনু ছিল

ইনুর কিছু ভাল লাগে না। আইসক্রিম খেতে ভাল লাগে না, সোনা, মোনা, পিকলুদের সঙ্গে চোর-চোর খেলতে ইচ্ছে করে না, বড়-বড় কানওলা ছোট্ট টমিটার কান টানতে ইচ্ছে করে না। এমন কী, কাল যখন ছোটকা বলেছিল, "এই ইনু, চিড়িয়াখানায় যাবি?" ও সঙ্গে সঙ্গে "না" বলে দিয়েছিল। অথচ ইনুর চিড়িয়াখানা কী সুন্দর লাগে। ও মোটে তিন দিন চিড়িয়াখানায় গেছে, কিন্তু এই তিন দিনেই সব্বার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। বাঘ, সিংহ, হাতি, জেব্রা, বাঁদর, আরও কত কী!

বাঁদরটাই সবচাইতে বেশী মজা করে। কী বড় বড় লাফ দেয়। ইনু ওকে তিনটে কলা দিয়েছিল। একসঙ্গে তিনটে কলা পেয়ে বাঁদরটা কী খুশী! ইনুর দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসেছিল। হাসিটা আর-কেউ দেখতে পায়নি, শুধু ইনু দেখেছিল। ছোটকাকে বলতে ছোটকা বলেছিল, "যাঃ, বাঁদর আবার হাসে নাকি?" ইনু যত বলে, "হেসেছিল, সত্যি বলছি হেসেছিল", ছোটকা তত বলে, "তোর মুণ্ডু! বাঁদর হাসতেই পারে না।" শুনে ওর খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। ছোটকার সঙ্গে অনেক-ক্ষণ কথা বলেনি। ছোটকার দেওয়া চিনেবাদাম খায়নি।

বাড়ি ফিরে ছোটকা বলেছিল, "আরে! সত্যিই তো! বইতে পড়েছি, বন্ধুদের দেখতে পেলে বাঁদর হাসে। শিগ্গিরই তোকে আর-একদিন চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাব আমাকে তুই বাঁদরের হাসি দেখাবি। কী রে, দেখাবি তো?" আর-একদিন চিড়িয়াখানায় যাবার নামে ইনুর সব রাগ পড়ে গেল। ও বলল, "হ্যাঁ দেখাব, ঠিক দেখাব, তবে তিনটে কলা দিতে হবে কিন্তু।"

ইনু চিড়িয়াখানা নিয়ে কত স্বপ্ন দেখেছে। রোজ ভাবত, কবে আবার চিড়িয়াখানায় যাবে। ছোটকাকে বললে ছোটকা খালি বলত, "আজ না, আজ আমার একটু কাজ আছে, পরে একদিন নিয়ে যাব।" সেই ছোটকা কাল যখন বলল, "এই ইনু, চিড়িয়াখানায় যাবি?" ইনু বলল, "না।" ছোটকা কতবার বলল, কিন্তু ও কিছুতেই রাজী হল না। ইনুর আজকাল কিছু ভাল লাগে না, খেলতে না, খেতে না, বেড়াতে যেতে না। শুধু মায়ের কাছে থাকতে ইচ্ছে করে, মায়ের সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছে করে, মায়ের বুকের মধ্যে শুয়ে ঘুমোতে ইচ্ছে করে। অথচ বড়রা ওকে মায়ের কাছে বেশীক্ষণ থাকতে দেয় না, মায়ের সঙ্গে সব সময় কথা বলতে দেয় না। মায়ের তো অসুখ করেছে, খুব অসুখ। সেই জন্যে ইনুর কিছু ভাল লাগে না।

একদিন, দুদিন, তিনদিন অসুখ করার পর মা ডাক্তারদের বাড়ি চলে গেল। ইনু রোজ ভাবে, মা আজ আসবে, কিন্তু মা আর আসে না তো আসেই না। মাকে দেখতে না-পেয়ে ওর ভীষণ কান্না পেত, কন্দিন লুকিয়ে কেঁদেছে, কন্দিন সবার সামনে কেঁদেছে। বাবা বলত, "কেঁদো না, মা ভাল হয়ে গেছে, আর দু-এক দিনের মধ্যে দেখো ঠিক বাড়িতে চলে আসবে।" ঠাকুমা কোলে নিয়ে বলত, "রাজপুত্তুর সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে যেই না রাক্ষসদের পাড়ায় গিয়ে ঢুকেছে ওমনি...।" ইনু জোর করে ঠাকুমার কোল থেকে নেমে পড়ে বলত, "শুনব না, শুনব না।" ও বুঝতে পারত, ঠাকুমা ওকে ভোলাবার জন্যে মিছিমিছি গল্প করছে।

একদিন মা সত্যি সত্যি ডাক্তারদের বাড়ি থেকে ফিরে এল। ইস্ মা কী রোগা হয়ে গেছে। একা-একা হাঁটতেও পারে না। দুই কাকীমা মাকে ট্যাক্সি থেকে ধরে-ধরে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিল। বিকেল-বেলায় দুজন ডাক্তার এসে কানে নল লাগিয়ে মাকে দেখল। তারপর কাগজকলম নিয়ে একগাদা ওষুধের নাম লিখে দিল।

ডাক্তার দুজনকে দেখে ইনুর ভীষণ রাগ হয়ে গেল।

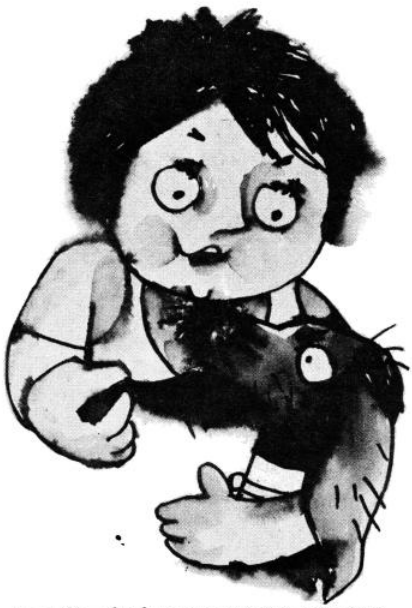

এদের বাড়িতে গিয়েই মা এত রোগা হয়ে গেছে। আর কোনোদিন ও মাকে ডাক্তারদের বাড়িতে যেতে দেবে না। একজন ডাক্তার আবার ইনুর সঙ্গে ভাব করতে এসেছিল, কিন্তু ও একটা কথাও বলেনি, ইচ্ছে করেই বলেনি। ডাক্তারবাবু ওর গালে টোকা দিয়ে বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন, "বল, তোমার নাম কী বল, বললে লজেন্স দেব।" ইনু একটা কথাও বলেনি। মনে মনে বলেছিল, "ইস! লজেন্স! আইসক্রিম দিলেও কথা বলব না, সন্দেশ দিলেও কথা বলব না, বেড়াতে নিয়ে

গেলেও কথা বলব না, তোমরা ভাল না, তোমরা আমার মাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে রোগা করে দিয়েছ।"

মা আগে ইনুকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলত, "লক্ষ্মী, সোনা আমার, বল তো তুমি বড় হয়ে কী হবে?" ইনু জানত না কী হলে মা খুশী হবে। ও তাই জিজ্ঞেস করত, "তুমি বল মা, কী হব।" মা বলত, "বড় হয়ে তুমি ডাক্তার হবে, অনেক বড় ডাক্তার। আমার অসুখ করলেই আমি বলব, ইনু কই, ইনু কই। তুমি বলবে, এই যে আমি। ব্যস, তুমি এসে আমার অসুখ সারিয়ে দেবে।"

ইনু আগে কখনো ডাক্তার দেখেনি। ও শুনে শুনে ভাবত ডাক্তাররা বুঝি ঠাকুরদের মতো। কাছে এলেই সবার কষ্ট সেরে যায়। মা তারপরে যতবার ওকে জিজ্ঞেস করেছে, "লক্ষী, সোনা আমার, বল তো তুমি বড় হয়ে কী হবে?" ইনু সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, "ডাক্তার হব মা, অনেক বড় ডাক্তার।"

কিন্তু এখন ডাক্তারদের ওপর ইনুর খুব রাগ। ডাক্তাররা মাকে রোগা করে দিয়েছে। মা এখন একা-একা হাঁটতে পারে না, দিন রাত্তির শুয়ে থাকে, ডাক্তাররা মাকে ভাত দিতে বারণ করেছে। মার ওষুধ খেতে একটুও ভাল লাগে না, অথচ মাকে সব সময় ওষুধ খেতে হয়। ওষুধগুলোর কী বিচ্ছিরি গন্ধ। সেদিন মেজদি কাঁচা লঙ্কা আর কাসুন্দি দিয়ে মেখে কাঁচামিঠে আম খাচ্ছিল টকাস্ টকাস করে। মা যেই না বলেছে "আমাকে একটু দিবি", অমনি মেজদি ছুটে ঘর থেকে পালিয়ে গেছে। সেই থেকে মেজদির ওপরেও ইনুর রাগ, তবে ডাক্তারদের ওপর অনেক অনেক বেশী রাগ। ও মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে, বড় হয়ে ও কক্ষনো ডাক্তার হবে না।

মায়ের কেন অসুখ করেছে, কবে সারবে, কেউ বলে না। জিজ্ঞেস করলে সবাই বলে, "ভাল হয়ে যাবে, ভাল হয়ে যাবে।" এক কথা শুনে শুনে ওর খুব রাগ হয়ে যায়। ও লুকিয়ে লুকিয়ে বাথরুমে গিয়ে তেলের শিশি মেঝেয় উল্টে দেয় আর সাবানটা ফেলে দেয় চৌবাচ্চার মধ্যে।

সেদিন বিকেলেই ছোটপিসি ওকে ছাতে নিয়ে গিয়ে বলে, "মায়ের অসুখ কেন করেছে জানিস?"

"কেন?"

"তুই দুষ্টুমি করিস বলে।"

"ধ্যাৎ!"

"হ্যাঁ, তুই দুষ্টুমি করিস, মায়ের কথা শুনিস না, খেতে বললে খাস না, একা-একা বড় রাস্তায় চলে যাস, ছড়া মুখস্থ করিস না, টমির কান ধরে টানিস, সেই জন্যে মায়ের অসুখ করেছে।"

"আহা, তাই কখনো হয়?"

"হ্যাঁ রে সত্যি, আচ্ছা আমি তিন সত্যি করছি, এক সত্যি, দুই সত্যি, তিন সত্যি।"

তিন সত্যি করলে কেউ তো আর মিথ্যে কথা বলতে পারে না। ছোটপিসি তাহলে সত্যি কথা বলছে। ইনুর হঠাৎই খুব কান্না পেয়ে গেল, ইস্, ওর জন্যেই মায়ের কতো কষ্ট, মা একা-একা হাঁটতে পারে না, দিন রাত্তির শুয়ে থাকে, মা কী রোগা হয়ে গেছে।

ও কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "ছোটপিসি, আমি এবার থেকে ভাল হব, দুষ্টুমি করব না, মায়ের কথা শুনব, একা-একা বড় রাস্তায় যাব না।"

শুনে ছোটপিসি বলল, "লক্ষ্মী ছেলে। এবার দেখবে তোমার মা ভাল হয়ে যাবে। তুমি রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে বলবে, ঠাকুর, আমার মাকে ভাল করে দাও, আমি আর দুষ্টুমি করব না।"

ইনু ঘাড় কাত করে বলল, "আচ্ছা।"

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই ইনু খাট থেকে নেমে পড়ল। তারপর সোজা চলে গেল ছাতে। ছাতে ঠাকুর-ঘর। ঠাকুমা, মা, কাকীমারা সবাই ঠাকুরঘরে বসে পুজো করে। অত সকালে কেউ আসে না। ইনু একা কোনো দিন ঠাকুরঘরে আসেনি। ঢুকতে ওর কেমন ভয়-ভয় করছিল। কিন্তু ভয় করলে তো চলবে না। মাকে ভাল করতেই হবে। টমিটা কোত্থেকে লম্বা কান দুলিয়ে ছুটে আসতে ওর সাহস হল। টমিকে বলল, "টমি, তুই একটু দাঁড়া, আমি এক্ষুণি আসছি।" বলেই এক ছুটে ঠাকুরঘরে ঢুকে পড়ল।

দেওয়ালে, ছোট-ছোট জলচৌকির ওপর অনেক ঠাকুরদেবতা। ইনু মেঝের ওপর ঢিপ করে মাথা ঠেকিয়ে বলল, "ঠাকুর, আমার মাকে ভাল করে দাও। ঠাকুর, আমার মাকে ভাল করে দাও। ঠাকুর, আমার মাকে ভাল করে দাও। আমি আর দুষ্টুমি করব না। মায়ের কথা শুনব, সত্যি বলছি শুনব।" ইনু লুকিয়ে পকেটে করে দুটো বাতাসা নিয়ে এসেছিল। ঠাকুরদের সামনে রেখে বলল, "তোমরা ভাগ করে খেও।"

টমি দরজার সামনে বসে ছিল। ইনু বেরিয়ে আসতেই লাফাতে শুরু করে দিল। টমি যত লাফায় ওর লম্বা লম্বা কান দুটো তত দুলতে থাকে। কান টেনে দেবার জন্যে ইনুর খুব লোভ হচ্ছিল। কিন্তু না, টমির কান টানলে মায়ের অসুখ সারবে না। ইনু কান টানার বদলে টমিকে কোলে নিয়ে খুব আদর করল। টমি কুঁই কুঁই করে কী যেন বলল। ইনুর মনে হল, টমি বলছে, "ইনুদা, তুমি খুব ভাল হয়ে গেছ। তোমার মা দেখো শিগ্গিরই ভাল হয়ে যাবে।"

ইনু সত্যি খুব ভাল হয়ে গেছে। সবার কথা শোনে। চান করার সময় চান করে, খাবার সময় খায়, একটুও খাবার নষ্ট করে না, সকাল আর সন্ধেবেলায় ছড়া মুখস্থ করে, একা-একা বড় রাস্তায় যায় না, এটা দাও সেটা দাও বলে বায়না করে না। সবাই বলে, ইনু কী লক্ষী ছেলে।

কিন্তু কেউ তো জানে না ইনু কেন লক্ষ্মী ছেলে হয়েছে। শুধু ইনু জানে। আর জানে ঠাকুররা। ও রোজ সকালে ঠাকুরদের প্রণাম করে তিনবার বলে, "ঠাকুর আমার মাকে ভাল করে দাও। আমি আর দুষ্টুমি করব না। মায়ের কথা শুনব।"

দু দিন ঝড় হল, তারপর একদিন বৃষ্টি হল, খুব বৃষ্টি। ইনুরা সেদিন আলুর চপ আর মুড়ি খেল। কাকীমা বলল, "বর্ষাকাল শুরু হল, এবার দেখবি প্রায়ই বৃষ্টি হবে।"

সত্যি, রোজই বৃষ্টি হয় এখন। ইনুদের বাড়ির সামনের বাগানটা রোদ্দুরে পুড়ে পুড়ে একদম ন্যাড়া হয়ে গিয়েছিল, সেখানে দেখতে দেখতে কী সুন্দর কচি-কচি ঘাস গজালো, ফুলগাছের শুকনো ডালে পাতা হল সবুজ-সবুজ।

টমিটা আজকাল খুব দুষ্টু হয়েছে। বৃষ্টি হলেই ছুটে বাইরে গিয়ে ভিজে আসে। ইনু কত বারণ করে, কিন্তু টমি কথা শোনে না। ইনুর খুব রাগ হয়, এক-

একদিন ওর লম্বা-লম্বা কান মলে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু না, কান মলে দিলে তো দুষ্টুমি করা হবে, আর দুষ্টুমি করলে তো মায়ের অসুখ ভাল হবে না।

ইনুর মা এখন আগের চাইতে অনেক ভাল হয়ে গেছে। একা-একা এঘর-ওঘর যায়, তবে রান্নাঘরে গিয়ে কাজ করতে পারে না। অল্প ভাত খায়। ইনুর বাবা ইনুকে বলেছে, "তোমার মা আর কয়েক দিনের মধ্যে একদম ভাল হয়ে যাবে, তখন মা তোমাকে নিয়ে শোবে। তুমি দেখবে তো মা ওষুধ খায় কিনা, ওষুধ না খেলে কিন্তু অসুখ সারবে না।"

শুনে ইনু মুখে কিছু বলল না, কিন্তু মনে মনে বলল, "ইস্! ওষুধ! আমি রোজ ঠাকুরকে ডাকি, লক্ষ্মী হয়ে থাকি, সেই জন্যেই তো মা ভাল হয়ে উঠছে। সত্যি-কি না, ছোটপিসিকে জিজ্ঞেস করে দেখ। ওষুধ ভাল না, ডাক্তাররা ভাল না, ডাক্তারদের বাড়ি গিয়ে মা কী রকম রোগা হয়ে গিয়েছিল, মনে নেই?"

একদিন বিকেলে ইনু বাগানে গিয়ে দেখে, ওমা, কত ফুল ফুটেছে! বেল, জুঁই, রজনীগন্ধা, আরও কত কী, ও তো সব ফুলের নাম জানে না। ফুলের গন্ধ কী সুন্দর! ইনু বড় বড় নিশ্বাস টেনে ফুলের গন্ধ নিল। মা যখন চান করে আসে, তখন মায়ের গা দিয়ে ঠিক এই রকম গন্ধ বার হয়।

সন্ধেবেলায় বাবা অফিস থেকে ফিরে এল। বাবার এক হাতে অ্যাত্তো বড় একটা মাছ আর এক হাতে অ্যাত্তো বড় এক প্যাকেট মিষ্টি। ইনু বাবাকে জিজ্ঞেস করল, "আমাদের বাড়িতে আজকে কি কেউ নেমন্তন্ন খেতে আসবে?"

বাবা বলল, "না তো। আজকে রাত্তিরে তুমি, তোমার মা আর আমরা সবাই একসঙ্গে খাব। ডাক্তারবাবু বলেছেন, মায়ের অসুখ একদম সেরে গেছে। খেয়েদেয়ে তুমি

আজকে মায়ের সঙ্গে ঘুমোবে।"

শুনে ইনুর সে কী আনন্দ! ছুটে পাশের বাড়ি গিয়ে সোনা, মোনা আর পিকলুকে বলে এল, "এই জানিস, মা না একদম ভাল হয়ে গেছে। মার আর অসুখ নেই। আমি আজ রাত্তিরে মার সঙ্গে ঘুমোবো।" তাই না শুনে সোনা, মোনা আর পিকলু হাত তালি দিয়ে বলল, "কী মজা! কী মজা!"

টমিটা তো বৃষ্টি হলেই ভিজে আসে। তাই টমিটার গায়ে সব সময় ধুলোবালি। কিন্তু ইনুর আজ এত আনন্দ হচ্ছিল যে, টমিকে কোলে নিয়ে খুব আদর করে বলল, "এই টমি, জানিস, মা না ভাল হয়ে গেছে। আজকে আমি মার সঙ্গে ঘুমোবো।" তাই না শুনে টমি খুব কুঁই কুঁই করল। ইনুর মনে হল টমি বলছে, "ইনুদা, মা তো ভাল হবেই। তুমি কত লক্ষ্মী হয়ে গেছ। আর তো আমার কান ধরে টানো না।"

ইনু মায়ের পাশে খেতে বসল। মায়ের ও-পাশে দুই কাকীমা, তারপরে মেজদি, তার পরে বাবা, ছোটকা মেজকাকা। খেতে খেতে কত গল্প হল, কত হাসি হল। মাকে দেখতে কী সুন্দর লাগছে। সবাই মাকে বলছে, "তুমি এটা খাও, তুমি ওটা খাও।" মা হাসছে আর বলছে, "আর কত খাব, আর কত খাব।"

যেই না খাওয়া শেষ হয়েছে, ওমনি ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হল। ইনুর অল্প-অল্প শীত করছিল আর ঘুম পাচ্ছিল খুব। ইনু মায়ের আঁচল ধরে বলল, "মা, আমি তোমার সঙ্গে ঘুমোবো।" মা ওকে কোলে তুলে নিয়ে গালে চুমু খেয়ে বলল, "হ্যাঁ, ঘুমোবেই তো। লক্ষ্মী সোনা আমার।" শুনে ইনুর এত আনন্দ হল যে মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকোলো। মায়ের গা দিয়ে বাগানের ফুলের গন্ধ বেরুচ্ছে, কিন্তু মাতো এখন চান করে আসেনি।

মা ওকে কোলে করে ঘরে নিয়ে এসে ছোট্ট নীল আলোটা জ্বালিয়ে দিল। নীল আলো ইনুর খুব ভাল লাগে। ও আর মায়ের কোল থেকে নামল না। মা ওকে কোলে করে নিয়েই শুয়ে পড়ল, তারপর বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিল। বাইরে ঝিমঝিম করে বৃষ্টি পড়ছে। ইস্, কী ভাল লাগছে ইনুর।

কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থেকে ইনু বলল, "মা, তোমার অসুখ কেন সেরে গেছে জানো?" মা বলল, "না তো।" ইনু বলল, "আমি না রোজ সকালে ঠাকুরকে বলতাম, ঠাকুর আমার মাকে ভাল করে দাও, আমি আর দুষ্টুমি করব না, লক্ষ্মী হয়ে থাকব, মায়ের কথা শুনব, সেইজন্যে ঠাকুর তোমাকে ভাল করে দিয়েছে।" তাই না শুনে ওর মা ওকে বুকের মধ্যে আরও টেনে নিয়ে বলল, "ওমা, তাই নাকি! আমি তো কিছু জানতাম না, সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার, ভাগ্যিস তুমি ঠাকুরকে ডেকেছিলে।" মায়ের কথা শুনে ইনুর সে কী আনন্দ!

একটু পরে ও আবার বলল, "মা তুমি আর ডাক্তারদের বাড়ি যাবে না, ডাক্তাররা তোমাকে রোগা করে দিয়েছিল, ভাত খেতে দিত না, খালি ওষুধ আর ওষুধ, ডাক্তাররা ভাল না।"

মা ওর গালে, কপালে অনেকগুলো চুমু খেয়ে বলল, "আমি আমার ইনু সোনাকে ছেড়ে আর কোথাও যাব না।"

ইনু ওর ছোট ছোট হাত দুটো দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "মা আমার ঘুম পেয়েছে, তুমি গান কর, আমি ঘুমোবো।"

মা গুন গুন করে গান করতে লাগল আর ইনু ঘুমিয়ে পড়ল।

ছবি এঁকেছেন ।। শৈবাল ঘোষ

মজার অঙ্ক অঙ্কের মজা

এবারে ১২৩৪৫৬৭৯ এই মজার সংখ্যাটা নিয়ে শেষ মজার ব্যাপারটা করো। একটা চার্ট করে দিচ্ছি, উত্তরটা তোমরা পাশে বসিয়ে নেবে। দারুণ মজার মজার উত্তর। করেই দেখো না।

১২৩৪৫৬৭৯× ৩= ?
১২৩৪৫৬৭৯×৩০= ?
১২৩৪৫৬৭৯×৫৭= ?

*

১২৩৪৫৬৭৯× ৬= ?
১২৩৪৫৬৭৯×৩৩= ?
১২৩৪৫৬৭৯×৬০= ?

*

১২৩৪৫৬৭৯×১২= ?
১২৩৪৫৬৭৯×৩৯= ?
১২৩৪৫৬৭৯×৩৬= ?

*

১২৩৪৫৬৭৯×১৫= ?
১২৩৪৫৬৭৯×৪২= ?
১২৩৪৫৬৭৯×৬৯= ?

১২৩৪৫৬৭৯×২১= ?
১২৩৪৫৬৭৯×৪৮= ?
১২৩৪৫৬৭৯×৭৫= ?

*

১২৩৪৫৬৭৯×২৪= ?
১২৩৪৫৬৭৯×৫১= ?
১২৩৪৫৬৭৯×৭৪= ?

*

আচ্ছা, প্রথম উত্তরটা না হয় করেই দিচ্ছি।

১২৩৪৫৬৭৯×৩=০৩৭, ০৩৭, ০৩৭।
১২৩৪৫৬৭৯×৩০=৩৭০, ৩৭০, ৩৭০।
১২৩৪৫৬৭৯×৫৭=৭০৩, ৭০৩, ৭০৩।

কেমন একই সংখ্যা ঘুরে-ফিরে আসছে দেখো। আরও মজার ব্যাপার, গুণফলের সংখ্যাগুলো যোগ করে ফেললে। ঠিক মাঝখানে যে গুণিতক, যোগফল হুবহু তাই। প্রথম তিনটির ক্ষেত্রে যেমন ৩০।

এ-রকম সংখ্যা আরও অনেক আছে অঙ্কে। তোমরাই একটা মাথা খাটিয়ে বার করো না!

শুভঙ্কর

সব শিশুদের অন্তরে

অরুণ বাগচী

বিমল-কুমার-জয়ন্ত-মানিকের লেখক হেমেন্দ্রকুমার তাঁর 'দেড়শো খোকার কাণ্ড' বইটিতে নিজেই একটা ভূমিকায় নেমে গেছেন। ছোট্ট নায়ক গোবিন্দর টাকা চুরি করে জটাধর পালাচ্ছে। গোবিন্দ না-ছোড় হয়ে তার পিছনে লেগেছে। চোখে চোখে রাখছে। জটাধর টুপ্ করে একটা ট্রামে উঠে পড়ল। গোবিন্দও উঠল। কনডাকটার বললে, টিকিট! মহাবিপদে পড়ল গোবিন্দ। পকেটে একটি পয়সাও নেই। এমন সময় বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন কে? 'খোকাখুকুদের বন্ধু' হেমেন্দ্রকুমার রায়!

তা হেমেন্দ্রকুমার ছোটদের সত্যিই বন্ধু ছিলেন। আমার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। খুব ছোটবেলা তাঁকে দেখেছি, বড় হয়েও দু-বার। এত জানতেন তিনি। আর অকৃপণভাবে সেই জানাটা সবার মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিতে চাইতেন। ছোটদের ভালবাসতেন অন্তর থেকে। অনবরত লিখে লিখে তাদের মনের ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটানোর ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আলস্য ছিল না। বিমল-কুমার-বাঘার গল্পগুলো শৈশবের অ্যাডভেনচারপ্রীতির কথা খেয়াল রেখে লেখা। জয়ন্ত-মানিক, হুম্মারকা সুন্দরবাবু আরও কিছু পরের দিকে এসেছেন রহস্য-কাহিনীর খোরাক নিয়ে। বিমলদের বাদ দিয়েও কত কাহিনী। ইতিহাস-ছোঁয়া 'পঞ্চনদের তীরে', বা 'ভারতের দ্বিতীয় প্রভাতে'। অথবা, প্রাগৈতিহাসিক যুগের গল্প 'মানুষের প্রথম অ্যাডভেনচার'—তুলনাহীন।

অবশ্য এমন কথা বলি না যে, ছোটদের ভালবাসতেন শুধু মাত্র হেমেন্দ্রকুমার। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার এঁরা তো ছিলেনই। আরও কতজনা। আমাদের আনন্দমেলার মুখ্যমণি স্বয়ং মৌমাছি? কী বই লিখেছেন 'যে গল্পের শেষ নেই'! আজও তার স্বাদ স্মৃতিতে জড়িয়ে আছে।

দেশের বাইরেও অনেক লেখক আছেন যাঁরা সব-শিশুদের বন্ধু। কিন্তু ছোটদের বন্ধু বলে বিদেশীদের মধ্যে একজন কাউকে যদি বেছে নিতে হয়, আমি নেব ওয়ালট ডিজনী-কে। সাধারণ অর্থে তিনি লেখক নন। শিল্পী, চলচ্চিত্রকার। মিকি মাউস, ডোনাল্ড ডাক যাঁর সৃষ্টি। কিন্তু ছোটদের জন্য তিনি বিচিত্র বিস্ময়, আনন্দ আর উপভোগের যে জগৎ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, বিপুল তার পরিধি।

ছোটবেলায় আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি কবে বড় হব, কত তাড়াতাড়ি দাদাকে ছাড়িয়ে বাবার মত বড় হয়ে যাব। যেখানে যখন ইচ্ছা যাব, যা প্রাণ চায় তাই করব। দুই পকেট ভর্তি পয়সা থাকবে। যখন যা মন হয়, কিনে নেব। প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মেই আমরা বড় হই, অর্থাৎ আমাদের বয়স বাড়ে। কিন্তু তখন আর দশ টাকার লজেন্স বা একশ টাকার ঘুড়ি কিনবার তাগিদ অনুভব করি না। অল্পবয়সে দোতলায় উঠবার সিঁড়ির পাশে দেয়ালে ফুটে ওঠা ভূতের মুখ পরে আর নজরে আসে না। পিছনের বাগানে পরী নামে চাঁদনি রাতে, বা কামরাঙা গাছের তলায় গুপ্তধন লুকানো আছে, এসব

বিশ্বাস লুপ্ত হয়ে যায়। আমরা বুঝতেও পারি না আরও কতকিছু ওই সঙ্গে জীবন থেকে হারিয়ে গেল।

ওয়ালট ডিজনীর কারিগরি হল আমাদের সেই হারানো দিন, হারানো সম্পদ খুঁজে খুঁজে এনে দেওয়া, জমিয়ে জমিয়ে রাখা। 'স্নো হোয়াইট আর সাতবামনের গল্প', 'সিন্ডারেলা' ইত্যাদি যে-সব কাহিনী পড়ে আমরা মোহিত হই, সেগুলি তিনি চলচ্চিত্র তুলে আমাদের উপহার দেন। মনের চোখে যে হাজার রঙের ফুলঝুরি দেখি, অপরূপ রূপে সিনেমার পর্দায় ধরে দেন। প্রথম দিকে শুধু আঁকা কারটুন সাজিয়ে সাজিয়ে তার ছবি তুলতেন। আঁকা চরিত্র জীবন্ত হয়ে হাসির খোরাক জোগাত। অল্প দৈর্ঘ্যের কারটুন-চিত্র সব। পরে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবিই তুলতে লাগলেন। ছোটদের মনকাড়া সব গল্পের চিত্ররূপ। কিন্তু যে ফিল্মেই তুলুন আর যা-ই করুন, তাঁর সব আয়োজনের মূল লক্ষ্য একটাই। প্রকৃতির অনন্ত বিস্ময়, আর মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ যে পুরস্কার জীবন, তার সমস্ত সৌন্দর্য সবার চোখের সামনে মেলে ধরা।

ছোটদের জন্য ওয়ালট ডিজনী তাঁর কর্মময় জীবনের সেরা স্বপ্নটিকে মূর্ত করে রেখেছেন ডিজনীল্যানডের মধ্যে। সালটা ১৯৫৪—ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশে সিনেমা-নগরী লস্ অ্যানজেলিস থেকে ছাব্বিশ মাইল দূরে কমলালেবুর দিগন্তজোড়া এক বাগানের ভিতর আধুনিক সব যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে একদল শ্রমিক এসে হাজির হল। স্থানীয় লোকরা শুনেছিল লেবুবাগানটা বিক্রি হয়ে গেছে। কারিগরদের দেখে ভাবল হয়তো তেলের জন্য মাটি খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়ে যাবে এবার। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরেই বোঝা গেল, কেউ মাটির

তলাকার গুপ্তধন খুঁজতে আসেনি। এসেছে মাটির উপরকার ঝোপ-জঙ্গল কেটে, খানাখন্দ বুজিয়ে, ইঁট-কাঠ-পাথরের এক জাদুনগরী গড়ে তুলতে। ধূলিধূসর প্রান্তরের উপর দিয়ে বয়ে গেল মানুষের তৈরী নদী। গজিয়ে উঠল ঘন বন। ফুঁড়ে উঠল পাহাড়। নতুন শহর। পরের বছর ১৭ জুলাই, তিরিশ হাজার বিশিষ্ট অতিথির উপস্থিতিতে ওয়ালট ডিজনী তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'ডিজনীল্যানড' উৎসর্গ করলেন দুনিয়ার সমস্ত শিশুদের উদ্দেশে। কুড়ি বছর ধরে দেখা তাঁর সুন্দর স্বপ্ন রূপে রঙে ঝলমলিয়ে উঠল রৌদ্রস্নাত আনাহাইম প্রান্তরের বুকে। সেদিন থেকে ডিজনীল্যানডের দিকে দর্শকদের স্রোত বইতে শুরু করেছে। আজ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে বার কোটি মানুষ পায়ের ধুলো দিয়েছেন জাদুনগরীতে। নিজেরা ধন্য হয়ে ফিরে গেছেন।

১৯৬৬-র নভেম্বরে আমেরিকা গেলাম। যাবার আগে চিঠি লিখেছিলাম ডিজনীকে, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা জানিয়ে। ওয়াশিংটনে পেঁছবার দুদিন পরেই চিঠি পেলাম তাঁর সেক্রেটারির কাছ থেকে। মিঃ ডিজনী আপনার চিঠি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি রোগশয্যায়। দূরদেশী আপনি, তবু আপনার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ তিনি নিতে পারছেন না। তিনি খুব খুশী হবেন যদি আপনি ডিজনীল্যানড যান। আর কেমন লাগল যদি দুছত্র লিখে জানান। ভারতীয় ছেলেমেয়েদের ভালবাসা জানাচ্ছেন তিনি—ইত্যাদি।

বস্টন্ শহরে তখন আমি। সহকর্মী হিরণ্ময় কারলেকারের সঙ্গে ডিনার খেতে গেছি হারভারড-এ এক অধ্যাপকের বাড়ি। টেলিভিশনের পর্দায় ফুটে উঠল ওয়ালট ডিজনীর হাসিভরা মুখচ্ছবি। দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে ভুগে ভুগে সেদিনই মারা গেছেন তিনি।

এরও মাস দেড়েক পরে গেলাম ডিজনীল্যানড। ডিজনী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর আমন্ত্রণ অপেক্ষা করে ছিল। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে ডিজনীল্যানডের সব কিছু দেখবার অবাধ ছাড়পত্র। বার বার দেখতে যাবার অধিকার দিয়ে রেখেছিলেন তিনি।

আমার হাতে সময় ছিল মাত্র একটি দিন। সত্তর একর-ব্যাপী সেই বিরাট কাণ্ডকারখানা দেখবার পক্ষে এক সপ্তাহও পর্যাপ্ত সময় নয়। তাড়াহুড়ো করে যতটা পারা যায়! আমি তো তবু গোটা দিন হাতে পেয়েছি। প্রেসিডেনট আইসেনহাওয়ার আর প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল থাকতে পেরেছিলেন মাত্রই কয়েক ঘণ্টা। সব না দেখে চলে আসতে অন্তত আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যে কষ্ট হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। আশা করি তোমরা অনেকেই ডিজনীল্যানড দেখতে যেতে পারবে। আমার মত বড় হয়ে নিজের ছেলেদের ফাঁকি দিয়ে যাওয়া নয়, ছোটবেলাতেই যেতে পারবে।

জাদুরাজ্য মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা। মেইন

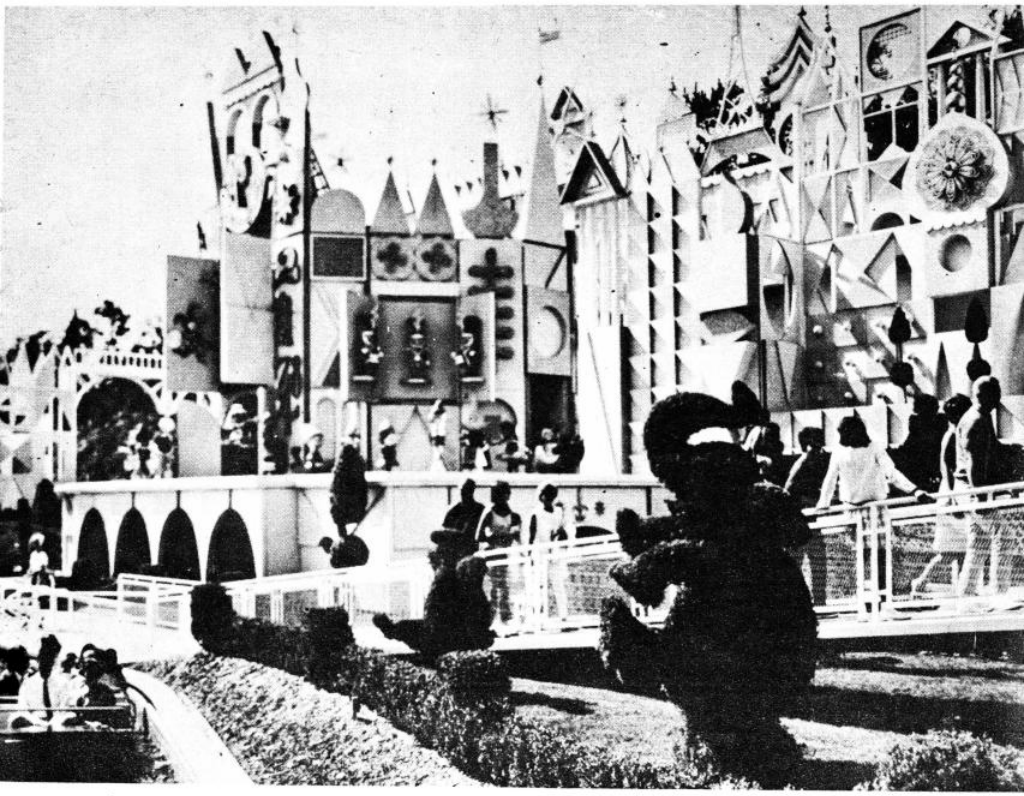

স্টিট ইউ-এস-এ, অ্যাডভেনচারল্যানড, ফ্রনটিয়ারল্যানড, টুমরোল্যানড এবং ফ্যানটাসিল্যানড। ছোট ছোট ট্রেনে চেপে সবগুলি দুনিয়া ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসা যায়। স্টিমারে করে নদীর উপর, অথবা নৌকো চেপে আফরিকার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অ্যাডভেনচার করতে যাওয়া যায়। ঝুপরি গাছে-গাছে বানরের দঙ্গল। রোদ্দুর-পোহান ঢাউস কুমির। হঠাৎ নৌকোর কাছেই হুশ করে ভেসে উঠল ইয়াব্বড়া একটা হিপো। আঁতকে উঠল গান্দাগোব্দা এক মেমসাহেব আর গুটিকয় বাচ্চা। দুম্ করে পিস্তল ছুড়ল নৌকোর মাঝি। আবার ডুব দিলে বজ্জাৎ হিপোটা। ছেলেরা তখন হাসতে শুরু করেছে। হিপোটা, পিস্তলটা, দুইই খেলনা—বুঝতে পেরে গেছে বাচ্চার দল। হাতে হাতে কেক বিলি করা শুরু করেছেন সেই গান্দা মেম।

ঢুকবার মুখেই এক প্রাসাদদুর্গ যার ভিতর ডাইনীর অভিশাপে ঘুমিয়ে থাকা রাজকন্যা। এদিকে টিকিরুম, যার দরজার কাছ থেকেই কানে আসবে অসংখ্য পাখির কলগীতি। একটা পাখিও জ্যান্ত নয়, ইলেকট্রনিক-চালিত কলের পাখি। বোঝে কার সাধ্যি। গান জুড়েছে ইন দি টিকি টিকি টিকি রুম...

আরও দূরে নদীর মধ্যে সেই দ্বীপ, টম সইয়ার যেখানে গিয়ে অ্যাডভেনচার করেছিল। গাছের উপর সুইস-পরিবার রবিনসনের খোড়োবাড়িগুলি। ক্যাপটেন নিমোর ডুবো-জাহাজ নটিলাস রয়েছে, ইচ্ছে হয় চড়। 'প্রাচীন পৃথিবী'-র পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখা যাবে দৈত্যাকার সব লুপ্তজগতের জীবজন্তুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, লড়াই করছে। টুমরোল্যানড হল—নাম থেকেই বুঝতে পার—আগামীদিনের বিজ্ঞানজগৎ, মানুষ যখন তার মর্ত্যসীমা ছাড়িয়ে মহাকাশদুনিয়ার বুকে হাজির হয়েছে। প্লেনে চেপে লনডন যাবার মত মহাকাশযানে চড়ে চাঁদ মঙ্গল ছুটোছুটি জুড়েছে।

ফ্যানটাসিল্যানডে একটা গুহার মুখ দিয়ে এক অপরূপ জগতে প্রবেশ করা। চারদিকে নানা ধরনের পুতুল-মানুষ। নাচছে গাইছে আনন্দধারা বইয়ে দিচ্ছে। গান হচ্ছে মাইকে : ফর ইট্স এ স্মল স্মল ওয়ারল্ড। তখন খেয়াল হবে এই অপরূপ জগৎ তো আমাদেরই পরিচিত পৃথিবী। ওই পুতুলগুলো তো আমরাই। কেউ শাদা, কেউ কালো। কেউ ইংরাজ, কেউ জারমান, কেউ জাপানী, কেউ নাইজিরীয়, কেউ ভারতী। ছোট্ট এই পৃথিবী, সব বৈচিত্র্য নিয়ে কত কাছাকাছি। গান ভালবাসা বন্ধুতা দিয়ে আরও কত কাছে আসতে পারি আমরা সবাই।

ডিজনীল্যানড বাড়ছে, ক্রমাগত বাড়ছে। বাড়ার শেষ নেই। ওয়ালট ডিজনীর ভাষায়—যতদিন পৃথিবীতে কল্পনা থাকবে, ততদিন ডিজনীল্যানড বড় হতে থাকবে। ২৩

ফকরা নিশি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বড়মামা বললেন, "তপু, তুই ঠিক চিনে যেতে পারবি তো?"

"হ্যাঁ মামা, পারব। আমি তো বড় হয়ে গেছি।"

বড়মামা হাসলেন। তপুর এই স্বভাব। একটু পাকা-পাকা কথা বলে।

গরমে কিংবা পুজোর ছুটিতে তপুকে রেখে আসে গোপাল। ছুটি ফুরোলে তপুর কাকা আবার দিয়ে যায়। এবারে গোপালের শরীর ভাল না। বড়মামা নিজেও যেতে পারতেন। কিন্তু এত বড় সংসার জমি-জমা গরু-বাছুর হাট-বাজার বলতে তিনিই সব। অথচ ছুটি পড়ে গেছে। ছেলের আর একদম মন টিকছে না। সঙ্গে লোক দেবারও কোনো সুরাহা করতে পারছেন না—কী যে করেন। তপুকে দেখলেই বুঝতে পারেন মায়ের জন্য তার ভারী কষ্ট হচ্ছে। ওর যাওয়া দরকার। তপু তখনই সাহস করে বলে ফেলেছে, "এই তো সনকান্দা পার হলে গরিপরদির মঠ। আমি মামা মাঠে নেমে ঠিক মঠ-বরাবর হাটব। তারপর দেখতে পাব সেই বাঁশের লম্বা সাঁকো। সাঁকো পার হলেই তো সাধুরচরের মন্দির। তারপর নদীর পারে-পারে হাটখোলা চলে যাব।"

তবু বড়মামা বললেন, "পাটক্ষেত সব বড় হয়ে গেছে। সাবধানে যাবি। কেউ কিছু দিলে খাবি না। হাটখোলা গেলে গাঁয়ের কেউ-না-কেউ থাকবে। ঠিক বাড়ি চলে যেতে পারবি।"

তপুর মামারা খুব গরিবও না, বড়লোকও না। গণ্য-মান্য করে সবাই। গ্রামের হাইস্কুলে বড়মামার খুব প্রভাব। স্কুল ছুটি হলে তপু একদণ্ড এখানে আর থাকতে চায় না। মামার অনুমতি পেয়ে সে খুব সকাল-সকাল দুটো সেদ্ধভাত, মাছভাজা খেয়ে বের হয়ে পড়ল। হাতে ছোট টিনের বাক্স, হাফ-হাতা শার্ট গায়ে, খাকি প্যান্ট পরনে। ছোট ছেলেটা গাঁয়ের পথে মাঠে নেমে যাবার আগে বড়োদের মতো চালে ঠাকুর-ঘরের দরজায় ঢিপঢিপ মাথা ঠুকল দুবার। যা সব ভয়। যেমন, সে ভয় পায় নিশির ডাককে, ভয় পায় গরিপরদির মাঠে বড় একটা অশথ গাছকে। এবং মানুষের চেয়ে এই সব অদৃশ্য আত্মাদের সম্পর্কেই তার ভয় বেশী। যে-কেউ তাকে ভেড়া ছাগল গরু বাছুর বানিয়ে ফেলতে পারে। যেমন খুশি তারা বগলে করে কোথাও নিয়ে গিয়ে তাকে জলে ডুবিয়ে মারতে পারে। অথবা সারা জীবন সে একটা গাছের নীচে পাথর হয়ে থাকবে। মা বাবা টেরও পাবে না, তাদের নিরুদ্দিষ্ট ছেলেটা বাড়ির পাশেই গাছের নীচে পাথর হয়ে আছে। এমন সব আজগুবি চিন্তা-ভাবনা মাঠে নামতে-না-নামতেই পেয়ে বসল। কেমন একটা ভয়-ভয়, একা একা কখনও সে এতদূর রাস্তা হেঁটে যায়নি। অপরিচিত গ্রাম মাঠে পড়ে সে খুব সতর্ক হয়ে গেল।

গ্রীষ্মের দিন বলে সব পাটগাছ মাথা ছাড়িয়ে ওপরে উঠে গেছে। আকাশে আবছা মেঘের ছায়া। কোথাও দূরে দিগন্তবিস্তৃত আউসের জমি। ধানক্ষেতে মাথলা মাথায় নিড়েন দিচ্ছে চাষীরা। তারা সমস্বরে গান গাইছিল। সবুজ মাঠ এবং চাষীদের এই প্রিয় গান তাকে বেশ ভালই রেখেছে। এখন সে যেন প্রায় পাখা থাকলে মায়ের কাছে উড়ে যেতে পারত। মা বাদে পৃথিবীর মানুষের আর কী থাকে, তা সে তখনও জানে না। ছোট ভাই পিলু তো ঠিক পুকুর-পাড়ে সকাল-বিকেল দাঁড়িয়ে আছে—দাদাকে দূরের মাঠে দেখেই দৌড়বে বাড়িতে, মা, দাদা আসছে, গোপালদা আসছে। এবারে সঙ্গে গোপালদা নেই। সে একা। বাবা-কাকারা ভীষণ অবাক হয়ে যাবে, এতটুকু ছেলে ঠিক চার ক্রোশ পথ চিনে চলে এসেছে। বলবে, তোর সাহস তো কম নয়। ভয় করল না?

একটুও না। এবং সে যত হাঁটছে, তত নিজের সঙ্গে কথা বলছিল। আম জাম অথবা জামরুল গাছটায় সে গিয়ে ঠিক পেয়ে যাবে থোকা থোকা ফল। গরমের ছুটিটা তার ভারী মনোরম। পুকুরে মাছ ধরা, আম কুড়োনো সারাদিন গাছতলায়। জাম পেকে গেছে সব। না-পাকলে সবুজ এবং ম্যাজেন্টা রঙের গাছগুলো দাঁড়িয়ে থাকবে—তপু কখন ফিরবে। বাড়ির বড় ছেলেটা গাছের নীচে ঘুরে না বেড়ালে তাদের ভাল লাগবে কেন।

তপু যতটা পারছে পাটের জমি সব এড়িয়ে যাচ্ছে। ভেতরে ঢুকে গেলে বড় গোলকধাঁধায় পড়ে যেতে হয়। পথ খুঁজে বের করা যায় না। কেমন সব গোলমাল হয়ে যায়। জমির পর জমি কতদূরে চলে গেছে। শুধু পাটের জমি। সবুজ মেঘের মতো অথবা নীল ঢেউয়ের মতো। ওরা আছড়ে পড়ছে আকাশের নীচে। সে যেখানে যত ধানের ক্ষেত পাচ্ছে, অথবা তরমুজের ক্ষেত, তার পাশে পাশে হাঁটছে। কখনও দূরের মঠ দেখা যাচ্ছে, কখনও দেখা যাচ্ছে না। পাটগাছগুলো সহসা আড়াল করে ফেলছে মঠটাকে।

পাটগাছগুলোর পাশে পাশে সরু সব আল। ঘাস সবুজ। কতরকমের পোকা উড়ছে। গুমোট গরম। তাকে কিছুটা পথ বেশী হাঁটতে হচ্ছে, তবু কিছুতেই ক্ষেতের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে না। ঢুকে গেলেই পাটগাছগুলো তাকে ঢেকে ফেলবে। প্রায় নদীর জলে ডুবে যাবার মতো। তখন সুযোগ বুঝে ওরা খুঁজে বেড়াবে তাকে। সে নিশির ডাক শুনতে পাবে। "তপু নাকি রে! কোথায় যাচ্ছিস, ঠিক যাচ্ছিস না। আমার সঙ্গে আয়। আমি তোকে বাড়ি পৌঁছে দেব।" তাকে লোভ দেখিয়ে কাছে নিয়ে যাবে, সেই যে ছোট হাত অথবা কঙ্কাল শরীরে ছুঁইয়ে দিলেই

ছাগল গরু ভেড়া। ওকে ভেড়া বানিয়ে হাটে-বাজারে বিক্রি করে দিলেও কিছু করার থাকবে না। কে জানে, তার বাবা-কাকা ভেড়াটা কিনে নিয়ে তারপর... না, তারপর সে আর ভাবতে পারে না, শরীর তার ভয়ে কেমন হিম হয়ে আসছিল। সে লোকজন দেখলে, এমন কী গরু ছাগল দেখলেও, বিশ্বাস করছে না। বেশ ঘাস খাচ্ছে, আসলে ওগুলোর রূপ হয়ত অন্যরকম। সব চর এরা। হ্যাঁ, যাচ্ছে তপু, তোমরা সব নজর রাখো। আর তখনই সে দেখতে পেল, দূরে কোনো মঠ নেই, আকাশের প্রান্তে কোনো ত্রিশূলে ভেসে নেই— কেবল জমি আর জমি, পাটের জমি। যেন পাঁচিলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক টপকে না যেতে পারলে সে আর মঠের চূড়ো দেখতে পাবে না। আর তখনই দূরে অনেক দূরে কে যেন তার নাম ধরে ডেকে উঠল। "অঃ তপু কর্তা, কোনখানে যান! ওডা তো পথ না। খাড়ন। আমি আপনেরে নিয়া যামু।"

সে পেছন ফিরে দেখল, হোগলার জঙ্গল থেকে অতিকায় দানবের মতো ভয়ংকর কিছু একটা বার হয়ে তাকে ধরবার জন্য ছুটে আসছে। মানুষ না, অথচ মানুষের মতো কথাবার্তা। সারা শরীর কালো পোশাকে ঢাকা। দাড়িতে মুখ দেখা যায় না। আর সেই কটর কটর মালা-তাবিজের শব্দ। যেন হুড়মুড় করে তার দিকে ধেয়ে আসছে। আতঙ্কে তার গলা-বুক শুকিয়ে আসছে। ভয়ের সময় আর কে আছে! না, কেউ না। খানিক দূরে সেই যে ফেলে এসেছিল তরমুজের জমি, লংকার গাছ আর মাথলা-মাথায় চাষীরা, কেউ নেই। কেবল মাঠ ভেঙে ধেয়ে আসছে লম্বা তালগাছের মতো একটা ফকির। রাত হলে ওর চোখ ঠিক জ্বলে উঠত দপ করে। দিনের বেলা বলে নিশির সেই প্রবল চোখের আগুন সে দেখতে পাচ্ছে না।

আর যায় কোথায়, সামনে কোনো পথ না পেয়ে পাট-গাছের সেই ঘন জঙ্গলের ভেতর তপু সেঁদিয়ে গেল। বগলের টিনের বাক্স ফেলে যত দৌড়ায়, তত পেছনে কে যেন ডাকে, "খাড়ন, আমি আইতাছি। দৌড়ান ক্যান!"

লম্বা-লম্বা পাট, যেন শেষ নেই। আলের ওপর দিয়ে সে দৌড়চ্ছে। গাছ থেকে সব পাতা ঝরছে, হাওয়ায় উড়ছে। গাছের নীচে কোনো আগাছা নেই। শুধু পচা পাটপাতা, আর বৃষ্টির জলে পচা পাটপাতার গন্ধ। সে কোনোরকমে পাটের জমি পার হয়ে গেলে ধানক্ষেত পাবে, এবং দূরের মঠ দেখতে পেলে সে আবার তার সব সাহস ফিরে পাবে। অথচ সে সোজা দৌড়তে পারছে না। সে কেবল ঘুরে ঘুরে মরছে। সে গাছের নীচে নদীর ঢেউয়ের মতো ভেসে যাচ্ছিল। হাঁসফাঁস করছিল গরমে। সবুজ ঘন অন্ধকারে তার চোখ ঘোলা হয়ে উঠছে। তখনও দূরে কেউ যেন ডেকে যাচ্ছে, "কই গ্যালেন, আমি আইতাছি।" সে এবার এলোপাথাড়ি ছুটছে। গাছের জন্য ছুটতে পারছে না। কেমন আটকে যাচ্ছে। পড়ে যাচ্ছে

কখনও। তারপর যখন বুঝতে পারছিল, এ-ভাবে ছটলে সে আর জীবনেও মঠের চূড়ো দেখতে পাবে না, তখন সে বসে পড়ল। এখন আর কোনো ডাক শুনতে পাচ্ছে না, কেবল কীটপতঙ্গের আওয়াজ, বাতাসে পাটগাছ দুলছে। তার কান্না পাচ্ছিল। এক আশ্চর্য গোলকধাঁধায় সে পড়ে গেছে। তার ওপরে ভ্যাপসা গরমে মরে যাচ্ছিল। জামা খুলে ফেলল, পায়ের কেড্‌স জুতোও। হাঁটতে গেলে লাগছে। সারা শরীর ছিঁড়ে ফুঁড়ে গেছে। কোথায় সে চলে এসেছে, তা ঠিক বুঝতে পারল না।

কখনও সে বসে থাকল গাছের নীচে, কখনও ঘাসের আলে শুয়ে থাকল। সে আর পারছিল না। সে বুঝতে পারছিল, নিশির হাত থেকে তার আর নিস্তার নেই। সবই নিশির খেলা। তখন কপাল ঠুকে সোজা একমুখো হাঁটতে থাকল। মাথা ঠাণ্ডা রেখে সে কিছুটা হেঁটে এসেই অবাক। সে এসে গেছে সেই বড় সাঁকোর নীচে। সামনে দিগন্তবিস্তৃত এখন শুধু ধানের জমি, অনেক পিছনে পড়ে আছে মঠের চূড়ো। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আর তখনই সাঁকোর নীচে সেই হাঁক—

"কর্তা তবে আইলেন। যাইবেন কই। জানি ঠিক শেষতক আইসা পড়বেন। বইস্যা আছি।" ভুতুড়ে লোকটা সাঁকোর নীচে বসে খুশিতে ফ্যাকফ্যাক করে হাসছে।

তপুর সারা শরীর ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে। তবু শেষ-বারের মতো রক্ষা পাবার জন্য সে উল্টোমুখে ছুটতে গিয়ে দেখল সাদা ফ্যাকাশে দুটো হাত ক্রমে এগিয়ে আসছে। "কৈ যান!" ঠিক সাঁকোর মতো লম্বা হয়ে যাচ্ছে হাত দুটো।

শরীরে আর তার বিন্দুমাত্র সাহস নেই। সুটকেসটা হাত থেকে পড়ে গেল। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। গলা বুক শুকিয়ে কাঠ। পা অসাড় হয়ে গেল। চোখে সর্ষেফুল দেখছে কেবল। বুঝতে পারছিল, সে মূর্ছা যাচ্ছে।

"তপু কর্তা! অঃ তপু কর্তা!"

কতকাল পরে যেন ও টের পাচ্ছে, কেউ তাকে ডাকছে। জলের ঝাপটা দিচ্ছে চোখে মুখে। আবার ডাকছে, "অঃ তপু কর্তা, আমি ফকরা। ওঠেন। চোখ খুলেন। আল্লা, এইডা কী হৈল।"

তপু পিটপিট করে তাকাচ্ছে।

"আমি ফকরা। আপনের মামায় কইল, ফকরা কৈ যাস?"

তপু সেই কিম্ভূতকিমাকার মানুষটাকে দেখে ফের ভয়ে চোখ বুজে ফেলেছে।

"কইলাম যামু হাটখোলায়।"

তপু মনে মনে বলল, বুঝি, তোমার শয়তানিটা বুঝি। ভালমানুষ সাজতে চাও।

"কইলেন,যাস তো তপুরে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিবি। তড়াতাড়ি যা। হাতে টিনের সুটকেস। রাস্তায় পাইয়া যাবি। ওঠেন। আপনের মায় আমারে চিনে। ডর নাই।"

তপু মার কথা শুনে কেমন সাহস পেয়ে গেল। বলল, "আমি তোমাকে ঠিক ধরে ফেলেছি। তুমি নিশি।"

ওর কথা শুনে ভয়ংকর লোকটা কেমন হাসতে চেষ্টা করল। পারল না। বলল, "মাইনসে কত কথা কয়। বাদ দেন অগো কথা। আমি ফকিরা। ফকরা। আপনার মামার বান্দা লোক।"

তপু এবার আরও জোর পেয়ে গেছে। মামার বান্দা লোক, মামদো ভাই। বড় মামার ভূতের কারবার-টারবার আছে সে জানত না। সে বলল, তুমি আমার পিছু নিয়েছ কেন?"

"চলেন, বাড়ি দিয়া আসি।"

"তুমি যাও। আমি একা যেতে পারব। আমার পিছু নেবে না।"

"রাইত বিরাইতে একা ডরাইবেন।"

তপু বুঝতে পারল, সূর্য অস্ত গেছে। শুধু চারপাশে সবুজ মাঠ। বাঁশের সাঁকোটা উটের মতো মুখ তুলে আছে আকাশের গায়ে। লোকজন সে একটা দেখতে পাচ্ছে না। দুটো-একটা নক্ষত্র আকাশে সে ফুটে উঠছে দেখতে পেল। সারা মাঠে আশ্চর্য কীটপতঙ্গের আওয়াজ। মাঠ ভেঙে ক্রোশখানেক পথ হেঁটে গেলে হাটখোলা। সে তবু বলল, "তুমি যাও। তোমার সঙ্গে যাব না।"

"এই দ্যাখেন," বলে সে তার লম্বা কালো আলখেল্লা খুলে ফেলল। গলার সাদা লাল নীল পাথরের মালা খুলে ফেলল। পরনে শুধু লুঙ্গি। খালি গা। বলল, "আমি ফকরা। ডর নাই, চলেন।"

সে তবু বিশ্বাস করতে পারছে না। প্রায় কঙ্কালসার ভূতের মতো চেহারা। বুকের হাড় গোনা যায়। সাদা ফ্যাকাশে। একগাল দাড়ি। সুরমা টেনেছে বুড়ো চোখে। জবাফুলের মতো ড্যাব ড্যাব করছে ঘোলা চোখ দুটো।

ভয়ংকর লোকটা বলল, "মুড়ি খাইবেন? চোখ মুখ কৈ গ্যাছে গিয়া। খান্।"

তপু সরে দাঁড়াল। ছুঁয়ে দিলেই সে কিছু-একটা হয়ে যাবে। নুড়ি পাথর। বগলের থলেতে পুরে নিতে একটুও অসুবিধা হবে না।

এবারে হি-হি করে হাসল ফকরা নিশি। গালে মুড়ি ফেলে মুড়মুড় করে খেল। ছোট্ট নেকড়ায় বাঁধা মুড়ি। হাঁ করে খাচ্ছিল। দু-চারটে দাঁত আছে। বাকী নেই। জিভ নেড়ে নেড়ে খাচ্ছে।

তপুর মনে হল, ফকরার ঠিক আলজিভ নেই। নিশি হলে থাকবে না। সে বলল, "হাঁ কর।"

ফকরা হাঁ করে থাকল।

"তোমার আলজিভ কোথায়?"

"দ্যাখেন।"

তপু দেখল। খুব সতর্ক থাকছে সে। সে আঙুলে দেখল লোহার আংটি। লোহা ধারণ করলে ভূতটুতের উপদ্রব কম থাকে। কিছুটা সে যেন ফকরাকে বিশ্বাস করতে পারছে।

তখন প্রায় ফোকলা দাঁতে হেসে ফকরা বলল, "পাটালি গুড় আছে। খাইবেন?"

মুড়ি-পাটালিগুড়ের কথায় তপুর জিভে প্রায় জল এসে গেল। কখন সেই সকালে বের হয়েছে। এতক্ষণ খিদে তেষ্টা কিছু ছিল না। এখন আবার সব পাচ্ছে। খিদেয় পেট জ্বালা করছে। সে তবু বলল, "না খাব না।"

"খান, খাইলে বল পাইবেন।"

সে চিৎকার করে বলল, "না, খাব না।"

ফকরা হাত জোড় করে বলল, "ঠিক আছে, আর কমু না।"

তপু এবার গলা উঁচিয়ে বলল, "তোমার থলেতে কী?"

ফকরা বলল, "মুশকিলাসান আছে, চুমরি গাইয়ের ঝাড়ন আছে। দ্যাখবেন!" বলে সে একটা কালো রঙের মাটির তিনমুখো কুপি বের করল। দু দিকের দুটো

মুখে নেকড়ার সলতে, একটা মুখে কাজল। ভেতরে তেল রাখার আধার। ফক্‌রা সলতে জ্বালিয়ে বলল, মুশকিলাসান। ভিক্ষা করতে বাইর হৈছি।"

তপু বলল, "থলেতে কী আছে?"

মুশকিল আসানের আলোতে থলে উপুড় করে দেখাল। আবছা মতো সারা মাঠে এখন অন্ধকার। আকাশে আরও সব নক্ষত্র। বাতাস শস্যক্ষেত্রে ঢেউ দিচ্ছে। ফক্‌রা এক-এক করে সব দেখাচ্ছে। কাগজের মোড়কে পাটালিগুড়, মুড়ির পুটুলি, দুটো বড়শির হুক, ছেঁড়া গামছা। সে গামছা ঝেড়ে বলল, "দ্যাখেন, আর কিছু নাই।"

তপুর সব সংশয় কমে আসছিল। কিন্তু ফক্‌রা নিশি বসে রয়েছে। ওর নীচে কিছু থাকতে পারে। মানুষের হাড়, কঙ্কাল. বাচ্চা ছেলের মুন্ডু যদি লুকিয়ে রাখে। সে বলল, "তুমি ওঠো।"

ফক্‌রা উঠে দাঁড়াল। বলল, "দ্যাখেন, কিছু নাই।"

তপু বলল. "তুমি বসো।"

ফক্‌রা বসলে আবার বলল তপু, "তুমি ওঠো বসো।"

ফকরা ওঠবোস করতে থাকল। তপু আর কিছু বলছে না। সে একবার ওপরে একবার নীচে তাকাচ্ছে। ভয়ংকর মানুষটা এখন হাঁপাচ্ছে। তাকে ভারী নির্জীব এবং ক্লান্ত দেখাচ্ছে। নিশিরা হাঁপায় না। ক্লান্ত হয় না।

সে এবার বলল. "হাঁটো।"

ফক্‌রা হাঁটতে থাকল।

"থলে টলে নাও।"

সে তার থলে টলে নিয়ে নিল।

তপু বলল, "মুড়ি দাও খাই।"

ফকরা মুড়ি আর পাটালি গুড় দিল।

মুড়ি খেতে খেতে তপু বলল, "তুমি আগে. আমি পেছনে।"

ফক্‌রা ঠিক আগে আগে কুপির আলোতে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে। পোকামাকড়ে কাটতে কতক্ষণ। সময় ভাল না। মুড়ি-গুড় খেয়ে তপুর জলতেষ্টা পেল। বলল, "জল খাব।"

ফক্‌রা বলল. "গাঁয়ে গেলে পানি মিলব। নালার পানি খাইলে মন্দ হইতে কতক্ষণ।" তপু বুঝল, লোকটা তবে সত্যি ভাল।

ফক্‌রা নিশি আগে। তপু পেছনে। আর ভয় ডর নেই। ফক্‌রা নিশি এখন সব নানা বায়নাক্কা করছে। বলছে, "বইনদিরে কমু, কী ওঠবোস করাইছে আপনের পোলায়। খাওয়ন দিতে হৈব। পেট ভইরা খামু। কতদিন পেট ভইরা খাই না।"

তপু বলল. "দেখব তুমি কত খেতে পার।"

"কতাগো অনেক খাই।"

এবং অনেক খায় বলে, অথবা পেট ভরে খেতে পাবে জেনে মনের সুখে অন্ধকার মাঠে সে গান জুড়ে দিল।

ফকরা নিশির মুশকিলাসানের কুপি দুলছিল। আলো দিচ্ছিল পথে। ওরা দুজন হেঁটে যাচ্ছিল। লোকটা পেট ভরে শুধু খেতে পাবে বলে গলা ছেড়ে কী জোরে গান গাইছে। তপু বুঝতে পারছিল না, কী এক অজ্ঞাত কারণে মানুষটার জন্য তার কষ্ট হচ্ছিল। চোখ দুটো জলে চিকচিক করছে। সে মানুষটার গা ঘেঁষে এখন হাঁটছে। হাঁটতে ভাল লাগছে।

ছবি এঁকেছেন ।। গৌতম রায়

হৈঃ চৈঃ এস্তাহার

হৈঃ চৈঃ এস্তাহার শুনলে কেমন যেন মনে হয় কিছু-একটা মজার ব্যাপার, হয়তো শিশুদের কোনো পত্রিকা-টত্রিকা। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা নয়, ভীষণ গুরুগম্ভীর, কঠিন পুলিশের নোটিশ এটা।

ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী কাজে বাংলাভাষা ব্যবহার হচ্ছে সেই ইংরেজ আমল এবং বোধহয় তারও আগে থেকে। ইংরেজ আমলে যে সরকারী গেজেট প্রকাশিত হতো, ত্রিপুরা স্টেট গেজেট, তাতে প্রকাশিত হতো পুলিশের এই বিজ্ঞাপন, নাম হৈঃ চৈঃ এস্তাহার। ফেরারি আসামীর খোঁজ চাই, অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহের পরিচয় চাই কিংবা কারো জিনিসপত্র হারিয়েছে, বন্দুক চুরি গেছে—এই সব নোটিশ সরকারী গেজেটে হৈঃ চৈঃ এস্তাহার নামে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের স্বাক্ষরে প্রকাশিত হতো।

সবচেয়ে দামী পোশাক

একটা পোশাকের দাম কত হতে পারে? খুব ভালো একটা জামা দেড়শো টাকা, ঝলমলে একটা বেনারসী হাজার টাকা। আর একটা ভালো ফ্রকের দাম, সবচেয়ে বেশী হলে পাঁচশো। এর বেশী আমরা ভাবতে পারি না।

কিন্তু রানী মেরি দ্য মেদিসি, ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে ফরাসী দেশের সম্রাজ্ঞী ছিলেন, একটা পোশাক বানিয়েছিলেন যাতে চল্লিশ হাজার মুক্তো আর তিন হাজার হীরে লাগানো হয়েছিলো। আজকের হিসাবে রানী মেরির পোশাকটির দাম হবে অন্তত পনেরো কোটি টাকা।

সবচেয়ে বড় কথা, এই পোশাকটি রানী মাত্র একবার পরেছিলেন, তাঁর ছেলের নামকরণ-উৎসবে।

কত জোরে কত আস্তে

যে কোনো দ্রুতগতি মোটর গাড়ির চেয়ে তিনগুণ জোর ওড়ে ফ্রিজেট পাখি। ক্যাপস্টিকডেল নামে এক সাহেব ১৯৪১ সালে যন্ত্র দিয়ে মেপেছিলেন, ফ্রিজেট পাখির গতি ঘণ্টায় ২৬০ মাইল।

চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ছোটে চিতা বাঘ; ঘণ্টায় সত্তর মাইল।

কীটপতঙ্গের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ড্রাগনমাছি মারাত্মক তীব্রগতি, ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল। মানুষ এর অর্ধেক জোরেও দৌড়তে পারে না।

আর, আস্তে চলা। বেশী কিছু বলে লাভ নেই, দুই প্রবাদপ্রসিদ্ধ জীব কচ্ছপ আর শামুকের কথা বলি। যে কচ্ছপ দৌড়-প্রতিযোগিতায় খরগোশকে হারিয়েছিলো, সে যত তাড়াতাড়িই ছুটে থাক, কিছুতেই ঘণ্টায় সাড়ে চারশো গজের চেয়ে বেশি ছোটেনি, কারণ কচ্ছপদের সর্বোচ্চ গতিই হলো চার ঘণ্টায় এক মাইল।

এবং শামুক। কথায় বলে, শম্বুকগতি। একটা শামুক যদি সোজাসুজি যায়, রাতদিন না থেমে যদি পুরো তিন সপ্তাহ বুকে হাঁটে, তা হলে ঐ তিন সপ্তাহ পরে সে এক মাইল দূরে পৌঁছাবে।

লেখকের নাম

শ্রাবণ সংখ্যা 'আনন্দমেলায়' 'কারজন পার্কে চারজন' ও 'পাগলা-পাগলা লোকটা' শীর্ষক ছড়া দুটি লিখেছিলেন যথাক্রমে শ্রীফণিভূষণ আচার্য ও শ্রীসুনীল বসু।

বিমল কর

কাপালিকরা এখনও আছে

উপন্যাস

আগে যা ঘটেছে

গঙ্গাচরণ মিত্তির লেনে থাকত তারাপদ। তিন কুলে তার কেউ ছিল না। একদিন একেবারে আচমকা তারাপদ একটা চিঠি পেল সলিসিটার মৃণাল দত্ত-র কাছ থেকে। মৃণাল দত্ত, তারাপদকে দেখা করতে বলেছেন। চিঠি পড়ে মনে হল, ভুজঙ্গভূষণ হাজরা নামের এক ভদ্রলোকের দেড় দু লাখ টাকার সম্পত্তি তারাপদর ভাগ্যে নচ্ছে। কিন্তু কে এই ভুজঙ্গভূষণ? তারাপদ চেনে না। পদবী থেকে অনুমান হয়, তিনি তারাপদর এক পিসেমশাই হতেও পারেন। তারাপদ তার ডাক্তার-বন্ধু চন্দনকে নিয়ে পুরোনো আলিপুরে মৃণাল দত্ত-র বাড়িতে দেখা করতে গেল সেদিনই সন্ধ্যে বেলায়।

মৃণাল দত্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা করলেন তারাপদকে। পরীক্ষায় তারাপদ আসল বলেই প্রমাণিত হল। মৃণাল দত্ত তখন ভুজঙ্গভূষণের ঠিকানা দিলেন। মধুপুরের কাছে শঙ্করপুরে ভুজঙ্গভূষণ থাকেন। কিছুদিন আগে তাঁর এক দুর্ঘটনা ঘটেছে, তিনি মরণাপন্ন। ভুজঙ্গভূষণ জীবিত থাকতে থাকতে যদি তারাপদ শংকরপুরে তাঁর কাছে মৃণাল দত্ত-র চিঠি নিয়ে পৌঁছতে পারে—তবেই সে ভুজঙ্গভূষণের সম্পত্তি পেতে পারে, নচেৎ নয়।

সেদিন রাত্রেই তারাপদ চন্দনকে সঙ্গে নিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়িতে উঠল। গাড়িতে আলাপ হল এক মজার মানুষের সঙ্গে, নাম তাঁর কিঙ্করকিশোর রায়, ছোট্ট করে 'কিকিরা'। এই ভদ্রলোকই তারাপদদের অবাক করে দিয়ে বললেন, ওরা যেখানে যাচ্ছে সেই জায়গাটার নামের প্রথম অক্ষর 'এস'; যার কাছে যাচ্ছে তাঁর নামের আদ্যাক্ষর 'বি'।

তারাপদরা কিকিরাকে সন্দেহ করতে লাগল। তাদের মনে হল, কিকিরা তারাপদর ব্যাগ থেকে কিছু হাতাবার মতলবে ওদের সঙ্গী হয়েছেন। তিনি যে কার চর, কোন্ পক্ষের, তা বুঝতে পারছিল না তারাপদরা। রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। তারাপদ আর চন্দন দুজনেই। কিকিরা কিন্তু ঘুমের ভান করে জেগে থাকলেন। সকালের দিকে তারাপদরা দেখল, তাদের কিছুই চুরি যায়নি। তখন চন্দন একটা ঝুঁকি নিয়ে কিকিরাকে সত্যি কথাটা বলতে বলল। কিকিরা বললেন, হ্যাঁ তিনি জানেন, তারাপদরা কোথায় যাচ্ছে, কার কাছে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে। ভুজঙ্গভূষণ যে কত বড় শয়তান, তাও তিনি বলে দিলেন।

শংকরপুরে গাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে সামান্য বেলা হয়ে গেল। মধুপুরে মিনিট কুড়ি দাঁড়িয়ে থাকল ট্রেন, কিসের একটা গণ্ডগোল হয়েছিল ইঞ্জিনে। শংকরপুরে পৌঁছতে হরেদরে আধ ঘণ্টা লেট্।

কিটব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে তারাপদরা প্লাটফর্মে নেমে পড়ল। ছোটখাট স্টেশন, তেমন একটা লোকজন ওঠা-নামা করল না। যারা নামল বা গাড়িতে উঠল, তাদের মধ্যে বেশির ভাগই দেহাতী মানুষজন।

প্লাটফর্মে নেমে তারাপদরা কিকিরার জানলার দিকে সরে এল। চন্দন বলল, "আপনিও নেমে গেলে পারতেন।"

কিকিরা মাথা নেড়ে বললেন, "না স্যার, এখন আমার নামা চলবে না। এখানে আমাকে দু-চারজন চেনে। আপনাদের সঙ্গে নামলে চোখে পড়ে যেতে পারি।"

তারাপদ বলল, "চোখে পড়লে কী হবে?"

"কী হবে তা কেমন করে বলব। সাবধানের মার নেই। আপনারা ভাববেন না; আমি যশিডির কাজকর্ম সেরে বিকেলের প্যাসেঞ্জার ট্রেনে এখানে ফিরে আসব। যা বলে দিয়েছি মনে রাখবেন, স্টেশনের পুব দিকে বালিয়াড়ির মতন জায়গাটার কাছে হরিরামের আস্তানা। ওখানে আমায় পাবেন। আপনাদের জন্যে আমি থাকব। আজ হয়ত আপনারা দেখা করার সময় পাবেন না। কাল দেখা করার চেষ্টা করবেন। যান স্যার, আর দাঁড়াবেন না। খুব সাবধানে থাকবেন, চোখ-কান খোলা রেখে। ভয় পাবেন না।"

তারাপদরা দাঁড়িয়ে থাকার কোনো কারণ দেখল না আর। গাড়িও ছাড়ব ছাড়ব করছে। হুইস্‌ল্ বেজে গেছে। ইঞ্জিনের দিকেও স্টীম ছাড়ার শব্দ উঠছে।

চন্দন হঠাৎ কিকিরাকে বলল, "আপনি আমাদের ক্ষমা করবেন; আমরা ভুল বুঝেছিলাম। বুঝতেই তো পারছেন—"

কিকিরা চন্দনের কথায় বাধা দিয়ে বললেন, "কিচ্ছু না, কিচ্ছু না স্যার, ক্ষমা-টমার দরকার নেই। আমি আপনাদের পেছনে আছি। আমার যতটা সাধ্য করব।"

ট্রেন ছেড়ে দিল। কিকিরা কেমন হাসি-হাসি অথচ মায়ামাখানো মুখ করে তারাপদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

তারাপদ একটু হাত ওঠাল, যেন বিদায় জানাল কিকিরাকে।

প্লাটফর্ম ততক্ষণে ফাঁকাই হয়ে এসেছে। দুই বন্ধু মিলে হাঁটতে লাগল।

টিকিট কালেক্টারকে টিকিট দিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াল ওরা। পাঁচ-সাতটা ছোট ছোট দোকান, এক

ফালি রেল কোয়ার্টার, মস্ত মস্ত ক'টা শিমুলগাছ ছাড়া আশেপাশে আর কিছু চোখে পড়ে না। পানের দোকান, দেহাতী মিঠাইয়ের দোকান। একপাশে কয়েকটা বুড়ো-বুড়ী গোছের লোক ছোট-ছোট ঝুড়ি করে বেগুন, কাঁচা টমাটো, অল্প ক'টা ফুলকপি বিক্রি করছে। খদ্দের বলতে রেলের বাবু আর খালাসী গোছের লোক। একদিকে ছোট এক হনুমান-মন্দির, বাঁশের আগায় পতাকা উড়ছে।

তারাপদ বলল, "চাঁদু, নো রিকশা? নাথিং?"

চন্দন বলল, "কিকিরা তো বলেই দিয়েছিলেন হাঁটতে হবে।"

"তা হলে নে, হাঁট।"

চারদিক তাকিয়ে চন্দন বলল, "ওদিকে একটা মাড়োয়ারীর দোকান দেখছি। চল্, আগে সিগারেট-ফিগারেট কিনে নিই। ভুজংগভূষণের মাঠ-মোকামের কথাও জেনে নেব।"

জায়গাটা এই রকম যে, তারাপদ আর চন্দনের মতন দুটি বাঙালী ছেলে কাঁধে কিট ব্যাগ ঝুলিয়ে নেমেছে, হাতে কম্বল ঝোলানো—এই দৃশ্যটাই যেন অনেকের কাছে কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠেছিল। সকলেই তাদের নজর করছিল। কালো জোয়ান গোছের একটা লোক সাইকেল কোমরের কাছে হেলিয়ে দেহাতী মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ময়লা কাচের গ্লাসে চা খাচ্ছিল। লোকটার চেহারা ষণ্ডার মতন, মাথা নেড়া, পরনে নীল একটা প্যান্ট, গায়ে কালো রঙের সোয়েটার।

চন্দন এবং তারাপদ দুজনেই তাকে দেখল।

তারাপদ ইশারা করে চন্দনকে বলল, "ভুজংগভূষণের লোক নাকি রে?"

চন্দন বলল, "ড্রেস থেকে রেলের লোক মনে হচ্ছে। মালগাড়ির ড্রাইভার হতে পারে।"

"বেটা আমাদের অমন করে দেখছে কেন?"

"দেখুক। তাকাস না। ইগ্‌নোর করে যা।"

সামান্য এগিয়ে চন্দনরা মাড়োয়ারীর দোকানটার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল।

দোকানটা দেখতে বড় নয়, কিন্তু হরেক রকম জিনিস রয়েছে। মুদির দোকান খানিকটা, খানিকটা মনিহারী। কবিরাজী তেল আর ভাস্কর লবণ ধরনের জিনিসও পাওয়া যায়।

সস্তা সিগারেট পাওয়া গেল। কয়েক প্যাকেট কিনে নিল চন্দন।

তারাপদ মাঠ-মোকামের কথাটা দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল। কিকিরা যদিও বলে দিয়েছিলেন রাস্তাটা, তবু তারাপদ জিজ্ঞেস করল। নতুন জায়গায় কিছু খুঁজে বের করতে হলে একজনের জায়গায় দুজন কি তিনজনকে জিজ্ঞেস করলে আরও নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

দোকানের ছোকরামতন লোকটি মাঠ-মোকামের যাবার রাস্তাটা বলে দিলেও দোকানের বাইরে যে বুড়োমতন লোকটি টিনের চেয়ারে বসে ছিল, সে কেমন কৌতূহলের সঙ্গে ভাঙা ভাঙা বাঙলায় হিন্দীতেই জিজ্ঞেস করল, "কাঁহা যাবেন?"

তারাপদ বলল, "ভুজঙ্গবাবুর বাড়ি।"

লোকটা অবাক হলেও নিজেকে যেন সামলে নিতে নিতে বলল, "ভুজ্‌অংগ্‌ মহারাজজী ? আচ্ছা আচ্ছা। যাইয়ে...।"

দোকানের বাইরে এসে তারাপদরা একটা নিমগাছের পাশ দিয়ে পাথরফেলা রাস্তাটা ধরল। সামান্য এগিয়ে চড়াই। চড়াইয়ের কাছে পৌঁছতেই ডান দিকে গ্রাম চোখে পড়ল। ছোট গ্রাম। কয়েকটা মাত্র ঘর। হরিরামের আস্তানা দেখা গেল না, টিলাটা চোখে পড়ল গ্রামের কাছাকাছি। ঝোপঝাড়ের আড়ালে আস্তানাটা বোধ হয় আড়াল পড়েছে। বাঁ দিকেও দু-একটা পাকা বাড়ি, বাঁধানো কুয়ো।

চড়াই ফুরিয়ে গেলেই বাঁ দিকের কাঁচা রাস্তা ধরতে হল।

জায়গাটা যে সুন্দর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। খটখটে শুকনো শক্ত মাটি, বিশাল বিশাল মাঠ, ঢেউ-খেলানো, মাঝে-মাঝে বড়-বড় পাথর পড়ে আছে, জংলা গাছ নানা রকমের, মাথার ওপর দিয়ে দু-চারটে বক উড়ে যাচ্ছে, রোদ টকটক করছে, শীতের বাতাস দিচ্ছে শনশন করে।

হাঁটতে হাঁটতে চন্দন বলল, "জায়গাটা কিন্তু চমৎকার, কী বলিস?"

তারাপদ বলল, "খু-ব ভাল। কিন্তু জায়গার কথা এখন ভাবতে পারছি না চাঁদু।"

"কেন?" জেনেশুনেও চন্দন বলল।

"ভুজঙ্গ যেরকম ফণা ধরে দাঁড়িয়ে আছে—" তারাপদ হাজার দুর্ভাবনার মধ্যেও তামাশা করবার চেষ্টা করল।

চন্দন হেসে বলল, "যা বলেছিস। ভুজঙ্গ যে কোন ফণা ধরে দাঁড়িয়ে আছে সামনে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কিকিরা যা বললেন তাতে লোকটাকে একটা আস্ত শয়তান বলেই মনে হচ্ছে।"

তারাপদ বলল, "কিকিরা কিন্তু সত্যিই বড় ভাল লোক।"

"আমরা ভাই ওঁকেই অবিশ্বাস করছিলাম। সত্যি, মানুষ চেনা বড় কঠিন।"

"সবই কঠিন। এই সংসার চেনাই কি সহজ। ধর না ভুজঙ্গভূষণের কথা। লোকটা এত শয়তান কিন্তু সেই লোক মরার আগে আমায় সম্পত্তি দেবার জন্যে ডেকে পাঠায়?"

চন্দন একটা ঝুলঝোপের পাশে বিশাল এক গিরগিটির মতন জীব দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। "তারা, দেখ।" চন্দন আঙুল দিয়ে জীবটাকে দেখাল।

তারাপদ বলল, "কী রে ওটা? তক্ষক নাকি?"

চন্দন পায়ের শব্দ করতেই জন্তুটা ঝোপের আড়ালে পালাল।

তারাপদ বলল, "ডেনজারাস্‌ জিনিস। বিষটিষ আছে বোধ হয়।"

চন্দন বলল, "তুই এক আচ্ছা জায়গায় এলি, কী বল? চারপাশেই ডেনজার।"

"সত্যি! এখন ভাবছি, টাকার লোভে মানুষ কী না করে।"

"আমার কিন্তু ভালই লাগছে।"

"ভালই লাগছে?"

"অ্যাড্‌ভেঞ্চার-অ্যাড্‌ভেঞ্চার মনে হচ্ছে। সেই যক্ষের ধনের মতন ব্যাপার। তোর পিসেমশাই ভুজঙ্গভূষণের গুপ্তধন উদ্ধারের প্লিটা মন্দ কী রে?"

তারাপদ দুঃখের শব্দ করে বলল, "গুপ্তধন উদ্ধার! বলেছিস বেশ। ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার।"

"কেন কেন? নিধিরাম কেন?"

"কিকিরার মুখে শুনলি না ভুজঙ্গ কেমন ভয়ংকর। তার সঙ্গে লড়ব আমরা? আমাদের কী আছে রে? নাথিং। একটা লাঠি পর্যন্ত হাতে নেই।"

চন্দন এবার মুচকি হেসে বলল, "আছে, আছে।"

"কী আছে?"

"বলব?"

"বল।"

"প্রথমে আছে কিকিরার হেল্‌প্‌। কিকিরা আমাদের সব রকম সাহায্য করবেন বলেছেন।"

"তুই বড় বাজে কথা বলিস, চাঁদু। কিকিরা একটা রুগ্ণ লোক, তাঁর একটা হাত একরকম অসাড়। ওই মানুষ তোকে মুখের কথায় ছাড়া আর কিসে সাহায্য করতে পারে?"

চন্দন একটা ছোট পাথর লাফ মেরে টপকে গেল। যেন তার হাত-পায়ের সাবলীল ভাবটা দেখাল। বলল, "শোন তারা, কিকিরা আমাদের কাছে চোদ্দ আনা কথাই ভাঙেননি। আমি তোকে বলছি, কিকিরা ভুজঙ্গভূষণের হাঁড়ির খবর রাখেন। কিকিরা ভুজঙ্গভূষণের শত্রু। কাজেই শত্রু যদি ভুজঙ্গভূষণের হাঁড়ির খবর দেন তাহলে আমরা সেটা জানতে পেরে যাচ্ছি। ওটা কম কাজে লাগবে না। দু নম্বর হল, কিকিরার অ্যাড্‌-ভাইস। সেটা খুব কাজের হবে। আর তিন নম্বর হল, আমার দুটো অস্ত্র।"

"অস্ত্র?" তারাপদ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

চন্দন মিটমিট করে হেসে বলল, "ভাই, যখন থেকে আমি ভুজঙ্গভূষণের কথা শুনেছি তখন থেকেই আমি তাঁকে সাসপেক্ট করেছি। ভুজঙ্গভূষণের দুর্গে ঢুকব অথচ একেবারে খালি হাতে তা কি হয়! আমি দুটো জিনিস সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। ইনজেকসানের সিরিঞ্জ, আর একটা পাতলা ছিপছিপে ছুরি।"

তারাপদ বন্ধুর এই ব্যাপারটাকে তামাশা মনে করে তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, "এই তোর অস্ত্র? আমি ভেবেছিলাম রিভলবার-টিভলবার নিয়ে এসেছিস।"

"ওটা আমি চালাতে জানি না। এ দুটো জানি।"

"তুই ভুজঙ্গকে ওই দিয়ে ভয় দেখাবি? সত্যি চাঁদু তোর যা বুদ্ধি!"

"ভয় দেখাব কেন? ভদ্রলোকের মতন সব যদি মিটমাট হয়ে যায়—তোর ভুজঙ্গভূষণকে ভগবানের হাতে দিয়ে আমরা কলকাতায় ফিরে যাব।"

তারাপদ যেন কী ভেবে বলল, "কিন্তু চাঁদু, যদি ভুজঙ্গ আগেই তোর চালাকি ধরতে পারে?"

চন্দন বলল, "ধরা পড়লেই বা কী হবে! আমরা কলকাতাতেই শুনেছি, ভুজঙ্গভূষণের অ্যাকাসডেণ্ট হয়েছে। আমি তোর ডাক্তার-বন্ধু; ইমার্জেন্সিতে কাজে লাগতে পারে ভেবে জিনিস দুটো এনেছি।"

যুক্তিটা তারাপদর পছন্দ হল। তবু বলল, "তুই স্টেথস্‌কোপটা এনেছিস?"

"না।"

"বাঃ, তা হলে? স্টেথোস্‌কোপ ছাড়া ডাক্তার হয়?"

"ভুলে গিয়েছি। তাড়াহুড়োর মধ্যে জরুরী জিনিস নিতে লোকে ভুল করে না? সেই রকম ভুল।"

তারাপদ কী যেন ভাবল, বলল, "শুধু ইনজেকসানের সিরিঞ্জ নিয়ে কী হবে? ওষুধপত্র?"

চন্দন বলল, "মাথা ধরা পেট ব্যথার দু-চারটে খুচরো ওষুধ ছাড়া ইনজেকসানের জন্যে মরফিয়ার দুটো অ্যাম্পুল এনেছি, আর-একটা অ্যাম্পুল আছে হার্টের গোলমালের ওষুধ। সবই ইমার্জেন্সির জন্যে।"

তারাপদ এক ফোঁটাও ডাক্তারি বোঝে না। কিন্তু চন্দনের এই উপস্থিত-বুদ্ধির জন্যে ওকে বাহবা দিতে ইচ্ছে করছিল। সত্যিই তো, একজন ডাক্তার বন্ধু নিয়ে সে মুখ-ঝলসানো ভুজঙ্গভূষণের কাছে আসছে, এ-রকম অবস্থায় একেবারে খালি হাতে কি আসা যায়?

চুপচাপ কয়েক পা এগিয়ে এসে তারাপদ বলল, "দেখ চাঁদু, ভুজঙ্গকে আমরা যতটা ভয় পাচ্ছি—এতটা ভয়ের কারণ আমাদের বেলায় নাও থাকতে পারে। কাল রাত্রেও ঠিক এতটা ভয় আমাদের ছিল না। আজ সকালে কিকিরাই আমাদের ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন। আমরা যতটা ভাবছি তা হয়ত কিছুই হবে না। তা ছাড়া আমি কি যেচে এসেছি? ভুজঙ্গভূষণই আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন।"

তারাপদ তার কথা শেষ করেনি, চন্দন অনেকটা দূরে গাছপালার আড়ালে একটা বাড়ি দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বলল, "তারা, ওই তোর মাঠ-মোকাম, ভুজঙ্গ ভূষণের বাড়ি।"

চন্দন তাকাল। জায়গাটা দেখার মতন। মাঠের ঢাল নেমে গেছে অনেকটা, চারদিকে জঙ্গলের ঝোপঝাড় গাছপালা, মনে হয় জঙ্গল বুঝি এখান থেকেই শুরু হয়েছে। ওরই এক পাশে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আড়ালের জন্যে বোঝা যাচ্ছে না বাড়িটা কেমন।

আরও আধ মাইলটাক হেঁটে তারাপদরা ভুজঙ্গ-ভূষণের বাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এটা বাড়ি না দুর্গ বোঝা যায় না। জেলখানার মতন উঁচু পাঁচিল দিয়ে চারদিক ঘেরা। গাছপালার অভাব নেই, আম জাম নিম কাঁঠাল থেকে শুরু করে শিমুল পর্যন্ত। জল বৃষ্টি রোদ সয়ে সয়ে পাঁচিলের গায়ে শ্যাওলার রঙ ধরেছে। কোথাও কোথাও কালো হয়ে গেছে। পাঁচিলের এ-পাশ থেকে বাড়ির সামান্যই চোখে পড়ে। অনেকটা ভেতর দিকে বাড়িটা। দোতলাই হবে। দোতলার রেলিং-দেওয়া বারান্দা চোখে পড়ছিল। কেমন একটা ফট্‌ফট শব্দ হচ্ছে, যেন একটা মোশিন গোছের কিছু চলছে।

তারাপদ বলল, "কিসের শব্দ রে?"

চন্দন বলল, "ডায়নামো বলে মনে হচ্ছে।"

"কি করে ডায়নামো দিয়ে?"

"বোধ হয় বাতিটাতি জ্বালায়।"

অবাক হয়ে তারাপদ বলল, "বাব্বা! বিশাল কারবার তা হলে?"

একটা জিনিস চন্দন লক্ষ করল। তারা বাড়ির হয় পেছনে না হয় পাশে কোথাও এসে দাঁড়িয়েছে। সামনের দিকটা নজরে আসছে না।

পাঁচিলের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চন্দন বলল, "আয়, সামনের দিকে যাই।"

শুকনো পাতা, গাছের সরু সরু ডাঙা ডালপালা, ছড়ানো পাথরের স্তূপ টপকে তারাপদরা বাড়ির সামনের দিকে এসে পড়ল। প্রথমেই চোখে পড়ল, লোহার ফটক। বিশাল ফটক। কারখানার গেটে যেমন দেখা যায়, অনেকটা সেই রকম। ফটকের একপাশে পাঁচিল জুড়ে ছোট একটা ঘর মতন। বোঝাই যায় পাহারা দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। খুবই আশ্চর্য, ফটকের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা মাঠের দিকে চলে গেছে—সেটা কাঁচা হলেও গাড়ি চলার দাগ। মরা ঘাস, কাঁকর-মেশানো মাটির ওপর চাকার দাগ। গরুর গাড়ি চললে যেমন

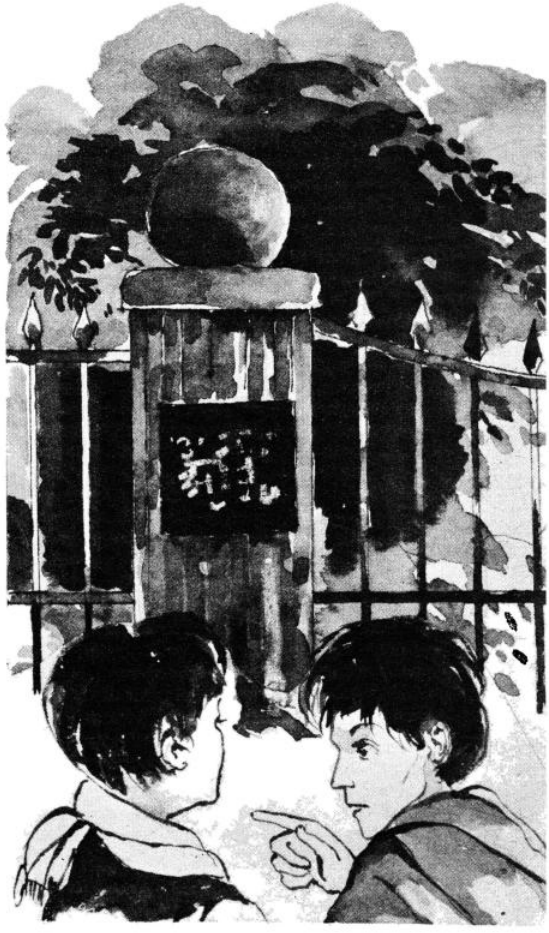

দাগ ধরে যায় মাটিতে। কিন্তু দাগের গর্ত গভীর নয়।

তারাপদ ফটকের সামনে এসে বলল, "এবার?"

চন্দন আশেপাশে কাউকে দেখতে পেল না। ফটক বন্ধ। পাহারা ঘরের গায়ে একটা ছোট ফটক রয়েছে, কিন্তু তালা দেওয়া। ফটকটা টপকানো যেত, যদি না মাথায় বর্শার ফলার মতন শিক থাকত।

গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকা ছাড়া চন্দন অন্য কোনো উপায় খুঁজে পেল না।

হঠাৎ তারাপদ বলল, "চাঁদু, এদিকে একবার দেখ।"

চন্দন তারাপদর কাছে গেল। বাঁ ফটকের পাশে থামের গায়ে একটা কী যেন লেখা আছে। লোকে সাদা পাথরের ওপরেই বরাবর কালো দিয়ে বাড়ির নামটাম লিখে এসেছে। এ একেবারে উলটো। কালো পাথরের ওপর সোনালী দিয়ে কিছু লেখা ছিল। সোনালী রঙ এখন প্রায় কালচে হয়ে এসেছে, অক্ষরগুলো বোঝা কণ্টকর, অর্ধেক নষ্ট হয়ে গিয়েছে, গিয়ে পাথরের খোদাইটুকু কোনো রকমে টিঁকে আছে। দেবনাগরী অক্ষরে কিছু লেখা। চন্দন দেবনাগরী বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছে, তারাপদ হয়ত বুঝতে পারত, কিন্তু ভাঙা অস্পষ্ট অক্ষর সে পড়তে পারছিল না।

খুব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে তারাপদ বলল, "সংস্কৃত মনে হচ্ছে। ঠিক ধরতে পারছি না, তবে আত্মাটাত্মা কিছু লেখা আছে।"

"আত্মা?"

"তাই তো দেখছি।"

চন্দন কী যেন ভাবল, বলল, "আত্মা পরে হবে। জোর খিদে পেয়ে গিয়েছে। নিজেদের আত্মা আগে বাঁচাই। আয় আগে তোর পিসেমশাইয়ের সঙ্গে মোলাকাত করি।"

তারাপদকে টেনে নিয়ে চন্দন পাহারা-ঘরটার কাছে এল। "টপকাতে পারবি?"

"পাগল, বর্শায় গিঁথে যাব।"

"তা হলে?...আচ্ছা, দাঁড়া, আমার কম্বলটা পাট করা রয়েছে। এটা বর্শার মাথায় দিচ্ছি। তুই ওই সেন্ট্রি পোস্টের গা ধরে ওঠ, উঠে টপকে যা।"

চন্দন যাকে সেন্ট্রি পোস্টের গা বলল সেটা পাহারা-ঘরের দেওয়ালই বলা যায়।

তারাপদ ইতস্তত করল। এই ফটকটা ছোট, ফুট চারেকেরও কম উঁচু মাটি থেকে। হাই জাম্প করেও পেরিয়ে যাওয়া যেত যদি জায়গা থাকত দু পাশে। অবশ্য তারাপদ স্পোর্টসম্যান নয়, চন্দন খানিকটা লাফ ঝাঁপ করতে পারে।

চন্দনের তাড়া খেয়ে তারাপদ মনে-মনে ভগবানকে ডেকে গেটের ওপর চেপে পড়ল।

কপাল ভাল, কোনো অঘটন ঘটল না। দুজনেই গেট টপকে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ভেতরে ঢুকে তারাপদরা দেখল, বাড়িটা ফটক থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে হবে। গড়নটা সেকেলে জমিদার-বাড়ির মতন, অবশ্য সামনের দিকে গোলাকার ভাব আছে। মজবুত বাড়ি, মস্ত মস্ত থাম, পাকাপোক্ত বারান্দা বাইরে। দূর থেকে মনে হয়, যেন বড় বড় পাথরে গাঁথা বাড়ি। বাইরে রঙচঙ কিছু নেই, কালচে হয়ে আছে, মানে ভুজঙ্গভূষণ বাইরের দিকে আর নজর দেন না। দেখতে বাড়িটা ছোট নয়। ভুজঙ্গভূষণ একলা মানুষ, এই বাড়ি নিয়ে কী করেন কে জানে।

ফটক থেকে যে-রাস্তাটা সোজা বাড়ির সদর সিঁড়িতে গিয়ে পড়েছে, তার দু পাশে বাগান। একসময় নিশ্চয় ফুলের বাগান ছিল, এখন ফুলটুল তেমন কিছু নেই, নানা ধরনের পাতাবাহার, জবা, গাঁদা আর এলোমেলো কিছু ফুলগাছ চোখে পড়ে। বাগানে বেদী আছে বসার। ঘাসগুলো মরে যাচ্ছে শীতে। কিছু লতাপাতা নিজের মতন বেড়ে যাচ্ছে। পাঁচিলের গা ধরে অবশ্য বড় বড় গাছ, নিম কাঁঠাল, আম, হরিতকী।

তারাপদ আর চন্দন ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেই ডায়নামোর শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ নেই। মানুষের গলা পাওয়া যাচ্ছে না, কারও কোনো রকম টিকি দেখা যাচ্ছে না। ক'টা প্রজাপতি উড়ছে বাগানে। রোদ আরও গাঢ়, রীতিমত তাপ লাগছে গায়ে। শীত যেন এই রোদের কাছে হার মেনে গেছে।

চন্দন বলল, "তারা, একটাও লোক নেই, কোনো সাড়াশব্দ নেই, তোর ভুজঙ্গভূষণ বেঁচে আছে তো?"

কথাটা শোনামাত্র তারাপদ যেন চমকে উঠল। সত্যিই তো, ভুজঙ্গভূষণ যদি মারা গিয়ে থাকে? ভুজঙ্গ নিজে অমাবস্যা পর্যন্ত বাঁচব বলেছে—কিন্তু মরা-বাঁচা কি মানুষের নিজের হাতে? ওটা ভগবানের হাত। যদি ভুজঙ্গভূষণ মারা গিয়ে থাকে তবে তো হয়েই গেল! তারাপদর এই ছুটে আশা বৃথা হল। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার যে আশা দেখা গিয়েছিল তাও গেল।

তারাপদ বেশ বুঝতে পারল, সে ভুজঙ্গভূষণকে জীবিত দেখতে চায়। টাকার লোভে, সম্পত্তির লোভে? অথচ এই ভুজঙ্গকে নিয়ে তাদের ভয় দুশ্চিন্তা কি কম!

পাথরকুচি-ছড়ানো রাস্তা দিয়ে বাড়ির একেবারে সামনের সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল তারাপদরা। তবু কোনো শব্দ নেই, কারও সাড়া নেই। একেবারে চুপচাপ সব।

চন্দন বন্ধুর দিকে তাকাল। "কী ব্যাপার রে?"

"কী জানি, বুঝতে পারছি না।"

"চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকব?"

"কাকে?"

"কেন, ভুজঙ্গভূষণকে!"

তারাপদ বুঝতে পারল না, কী বলবে।

পাঁচ-সাত ধাপ সিঁড়ি উঠে গেল ওরা। বারান্দায় উঠে এসে দাঁড়াল। সামনেই একটা বড়-মতন ঘর। দরজা খোলা। বারান্দার একদিকে গোটা দুই চেয়ার পাতা রয়েছে।

চন্দন ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে উঁকি মারতে যাচ্ছিল এমন সময় পাশের ঘর থেকে কে বাইরে এসে দাঁড়াল। চন্দন তাকাল।

তারাপদ একদৃষ্টে লোকটিকে দেখছিল। তারপর অবাক হয়ে বলল, "সাধুমামা!"

সাধুমামা যেন তারাপদকে চিনতে পারছিলেন না। তাকিয়ে থাকলেন।

তারাপদ আবার বলল, "সাধুমামা, আমি তারাপদ। তোমার এ কী চেহারা হয়েছে? তুমি ওভাবে আমায় দেখছ কেন? আমায় চিনতে পারছ না?"

সাধুমামার শরীর কংকালের মতন, মাথার চুল একেবারে সাদা, ঘাড় পর্যন্ত ছড়ানো, মুখের মাংস কুঁচকে বিশ্রী হয়ে গেছে। বীভৎস দেখাচ্ছে। কিছু যেন হয়েছিল মুখে। কাটাকুটি, ঘা, নাকি সাধুমামারও মুখ পুড়ে গিয়েছিল বোঝা যাচ্ছে না। সাধুমামা এমন অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকলেন যেন সত্যিই তারাপদকে চিনতে

পারছেন না।

তারাপদ বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, সাধুমামা তাকে চিনতেও পারছেন না। বছর দেড় দুই আগেও সাধুমামা তার কাছে গিয়েছিলেন।

এমন সময় একেবারে আচমকা ভয়ংকর গম্ভীর গলায় কে যেন বলল, "ওদের হলঘরে বসাও। বসিয়ে তুমি ওপরে আমার কাছে এসো।"

তারাপদরা চমকে উঠল।

কে যে কথাটা বলল দেখবার জন্যে তারাপদরা তাকাল। কাউকে দেখতে পেল না কোথাও। গলার স্বরটা কী গম্ভীর, কী কঠিন। গমগম করে উঠল যেন বারান্দাটা। কিন্তু কে কথা বলল? কে?

সাধুমামা ওই গলা শোনামাত্র বাড়ির চাকরবাকরের মতন হাত দেখিয়ে তারাপদদের মায়ের ঘরটার দিকে যেতে ইশারা করলেন। কথা বললেন না।

(ক্রমশ)

ছবি এঁকেছেন ॥ শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

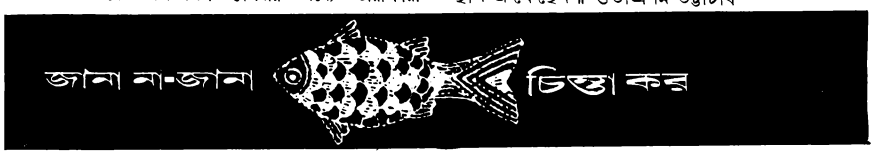

পাথর কখনো সাঁতার কাটে?

একটা পদ্যে এমন কথা আছে যে, যদি দেখা যায় বাঁদর গান গাইছে কিংবা জলে পাথর ভেসে যাচ্ছে, তবুও প্রত্যয় হয় না। আবার, 'এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা' এমন একটা বিস্ময়সূচক কথাও হয়তো তোমরা শুনেছো। সাধারণ বিচার-বুদ্ধিতে অসম্ভব কোনো কিছু যদি চোখের সামনে ঘটে যায় বা যা ভাবা যায়নি তেমন কিছু ঘটলে আমরা বলতে চাই যে, ওহ্যাবা, জলে পাথর ভাসার মতই অসম্ভব ঘটনাটা কীভাবে ঘটলো! কিন্তু জলে পাথর ভাসাটা কি সত্যিই এতো অসম্ভব?

ঠিকই যে, সাধারণ দশটা পাথর জলে ফেললে তৎক্ষণাৎ ডুবে যায়, ভেসে থাকতে পারে না। কিন্তু পৃথিবীর দু-চারটি অঞ্চলে এমন এক বিশেষ ধরনের পাথর পাওয়া যায়, যেগুলি সত্যি সত্যি জলে ভাসে। তাদের এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখলে হঠাৎ একটু ধন্ধ লাগে ঠিকই; কিন্তু যে-কারণে ওরা ভাসে, তা বুঝলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। গঠনগত বৈচিত্র্যই ওদের আর-পাঁচটা পাথর থেকে এ-ব্যাপারে আলাদা করেছে, এমন অসাধারণ করেছে ওদের।

কাগজের মতো পাতলা সোজা-সোজা পাতের মতো স্তরে পাথরগুলি গঠিত হয়। ঐ সব স্তর পরস্পরকে বিভিন্ন দিকে ছেদ করে। এইভাবে গঠিত হওয়ায় এ-জাতীয় পাথরের মধ্যে অনেক ফাঁকফোকর থাকে। ঐসব গর্ত বা ফাঁকফোকর থাকায় পাথরটি দিব্যি হালকা হয়ে যায়—আকার অনুযায়ী যতটা ভারী হওয়ার কথা, তার তুলনায় ঢের কম ওজন হয় ওদের। এভাবে হালকা হয়ে যাওয়ায় এই ধরনের পাথর জলেও বেশ ভেসে থাকতে পারে। কোনো বস্তু জলে বা যে-কোনো তরলে ডুববে না ভেসে থাকবে, তা নির্ভর করে বস্তুটির ওজন সম-আয়তন জল বা ঐ তরলের ওজনের চেয়ে বেশী না কম, তার ওপর। বেশী হলে ডুবে যায়, কম হলে ভেসে থাকে—সমান হলে, ভেতরে যেখানে হোক থেকে যেতে পারে।

ভেতরে অনেক ফাঁক ফোকর থাকায় এ জাতীয় পাথরের ওজন সম-আয়তন জলের ওজনের চেয়ে কম বলে, জলে ভাসে। ভেসে থাকে—একটু অলঙ্কারযোগে বলা হয়, সাঁতার কাটে। এ জন্যই এ ধরনের পাথরের নাম 'সাঁতারু পাথর'—ইংরেজীতে বলে 'সুইমিং স্টোন'।এরকম একটা পাথর পেলে বেশ হয়, তাই না! কিন্তু পাওয়া সহজ নয়, খুবই দুর্লভ এই পাথরগুলি।

আমাদের শরীর গরম কেন?

যতদিন বাঁচি, আমাদের শরীর গরম থাকে, মৃত্যুর পরে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এই জীবনব্যাপী তাপ আসে কোত্থেকে!

কি জানো, আমাদের জীবন্ত শরীরের ভেতরে এক বিরামহীন দহনকার্য চলছে। আমরা যে খাবার খাই, তাই এবং ঐ সঙ্গে আমাদের মাংসপেশীর শর্করা ও স্নেহপদার্থ ঐ দহনের উপাদান। তোমরা জানো, যে কোনো দহনের জন্য অকসিজেনের সহায়তা প্রয়োজন। আমাদের শরীরের অভ্যন্তরস্থ দহনের জন্য প্রয়োজনীয় অকসিজেন আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করি।

এই দহনই আমাদের শারীরিক শক্তির উৎস; বেশী পরিশ্রম করলে আমরা যে হাঁপাই তার কারণ, পরিশ্রমের ফলে অতিরিক্ত শক্তি ব্যয় হয় বলে, তা পূরণের জন্য দ্রুত, বেশী পরিমাণ দহনের প্রয়োজন--আবশ্যকীয় বেশী অকসিজেনের জন্য আমরা ঘন ঘন শ্বাস নিই। প্রশ্বাসে বাতাস আমাদের ফুসফুসে যায়—রক্ত সেখান থেকে অকসিজেন শরীরের বিভিন্ন অংশে নিয়ে যায়।

আমাদের অভ্যন্তরীণ দহনের বেশির ভাগই ঘটছে পেশী আর লিভারে। খেললে বা ব্যায়াম করলে শরীরের তাপমাত্রা বাড়ে, কেননা, তখন পেশীতে সংকোচনের ফলে দ্রুত অনেকখানি শর্করা আর স্নেহ পদার্থ পুড়ে যায়। ক্ষুধার্ত হলে আমাদের শরীর খারাপ লাগে, তার কারণ, খাদ্যের অভাবে, বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় যেটুকু তাপ, তা লাভের জন্য পেশীতে অতিরিক্ত দহন হয়। লিভার ও পেশীতে ঐ দহনকার্য বিরামহীনভাবে চলেছে। যে রক্ত পেশী বা লিভার ত্যাগ করে বেরিয়ে যাচ্ছে তার তাপমাত্রা, প্রবেশকারী রক্তের তাপমাত্রা অপেক্ষা বেশী।

শরীরের সব অংশ যদিও সমপরিমাণ তাপ সৃষ্টি করে না, রক্ত চলাচলের ফলে সারা শরীরে তাপমাত্রা কিন্তু মোটামুটি একই, উনিশ-বিশ হতে পারে। গরম অংশ থেকে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গায় তাপ রক্ত বহন করে নিয়ে যায়।

তাপসৃষ্টি যেমন করছে, আমাদের শরীর কিন্তু একই সঙ্গে নানাভাবে এমন পরিমাণ তাপ ত্যাগ করছে, যাতে শরীরে যে-টুকু তাপ চাই, ঠিক সেটুকুই থাকে। আমাদের শরীর তাপ ত্যাগ না করে একতরফা তাপ সৃষ্টি করতো যদি, আমাদের শরীরের তাপমাত্রা হু-হু করে এমন বেড়ে যেতো যে, আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকাই সম্ভব হতো না।

রাজায় রাজায়

কি করে দাবা খেলতে হয়

রাজায় রাজায়

রাজা অমূল্য, দাবা খেলায় রাজাকে মেরে দেওয়া যায় না। রাজাকে আক্রমণ কিন্তু করা যায়। রাজাকে আক্রমণ করাকে কিস্তি দেওয়া বলে।

কিস্তি দিলে রাজাকে আত্মরক্ষা করতেই হবে, সেটাই হবে খেলোয়াড়ের প্রধান কাজ। তিনটে উপায়ে রাজাকে বাঁচানো যায়। এক ঃ বিপজ্জনক ঘর থেকে সরে অন্য ঘরে চলে যাওয়া; দুই ঃ যে ঘুঁটির সাহায্যে কিস্তি দেওয়া হয়েছে সেটিকে মেরে দেওয়া; এবং তিন ঃ যে ঘুঁটির সাহায্যে কিস্তি দেওয়া হয়েছে, রাজার এবং সেই ঘুঁটির মধ্যে অন্য একটি ঘুঁটি এনে রাজার বিপদকে ঢেকে দেওয়া।

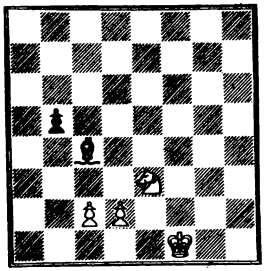

সাদা রাজাকে কালো গজ কিস্তি দিয়েছে। এখন সাদা ঘোড়ার সাহায্যে ঐ গজকে মেরে দিলে কিস্তি থেকে সাদা রাজা রেহাই পায়। এ ছাড়া, সাদা বোড়ে এক ঘর উপরের দিকে ঠেলে দিলে কালো গজের পথ বন্ধ হয়। তৃতীয় উপায় হল রাজাকে তার পাশের চারটি ঘরের একটিতে সরিয়ে দেওয়া। রাজার পাশে পাঁচটি ঘর আছে, কিন্তু তার একটিতে রাজা যেতে পারে না—কেন বলতো?

এই তিনটি উপায়ের যে-কোন একটি করা সম্ভব যদি না হয় তা হলে বলা হবে কিস্তি মাত! অর্থাৎ যে রাজাকে কিস্তি দেওয়া হয়েছে সেই দলের পরাজয় হয়েছে। কিস্তি মাত হলে খেলাও শেষ হয়ে যায়।

রাজার আর-একটা চাল আছে,

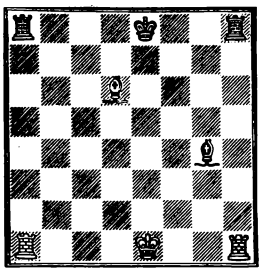

ক্যাসল করার আগে সাদা ও কালো রাজা। সাদা রাজা মন্ত্রীর দিকে ক্যাসল করতে পারে না, কেননা সেদিকে কালো গজের দৃষ্টি রয়েছে — কিন্তু সাদা রাজা অন্য দিকে ক্যাসল করতে পারে। কালো রাজা মন্ত্রীর দিকে ক্যাসল করতে পারে, কিন্তু নিজের দিকে নয়, কেননা রাজাকে যে পথ দিয়ে যেতে হবে তার একটি ঘরের উপর সাদা গজের দৃষ্টি রয়েছে।

সেটা হল খেলার এক সময়ে এক চালে রাজাকে দু ঘর পাশাপাশি সরিয়ে আনা, এবং সেই চালেই নৌকোকে দু-ঘর পাশাপাশি সরিয়ে দেওয়া। এটাকে বলে রাজার দিকে ঘর বাঁধা বা "ক্যাসল' করা। মন্ত্রীর দিকেও ক্যাসল করা যায়, তবে সেক্ষেত্রে রাজা দু ঘর পাশাপাশি সরে যায়, কিন্তু নৌকো সরে যায় তিন ঘর। একটি খেলায় সাদা একবার এবং কালো একবার এই রকম ক্যাসল করতে পারে। তবে সেটা ইচ্ছের উপর নির্ভর করে।

ক্যাসল করার সময় অবশ্য দেখতে হবে ক্যাসল করার আগের কোন চালে নৌকো বা রাজা তাদের স্থান পরিবর্তন করেনি, আরো দেখতে হবে যে-দিকে ক্যাসল করা হবে সে-দিকে যেন কোন ঘুঁটি না থাকে। রাজা এবং যে দিকের নৌকোর সঙ্গে ক্যাসল করা হবে সেই নৌকোর মাঝামাঝি কোন ঘুঁটি থাকা চলবে না। আর-একটি কথা, যখন প্রতিপক্ষ কিস্তি দিয়েছে সেই সময় কিস্তির হাত থেকে বাঁচার জন্য ক্যাসল করা যায় না।

দাবার নিয়ম বড়ই কড়া। রাজাকে কিস্তি দেওয়া হয়নি, কিন্তু ক্যাসল করার সময় যদি দেখা যায় রাজাকে এমন একটা ঘরের উপর দিয়ে যেতে হবে যেটার উপর প্রতিপক্ষের কোন ঘুঁটির দৃষ্টি আছে তা হলেও কিন্তু তখন ক্যাসল করা যায় না। নৌকোর বেলায় সে নিয়ম খাটে না। ক্যাসল করার সময় নৌকো প্রতিপক্ষের দৃষ্টি আছে এমন ঘরও অতিক্রম করতে পারে।

ক্যাসল কথাটার অর্থ হল দুর্গ। আমরা যে ঘুঁটিকে বলি নৌকো, ইউরোপে সেটার নামই ক্যাসল। তাই এর চেহারাটাও দুর্গের মতই দেখতে।

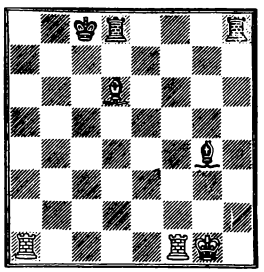

ক্যাসল করার পর সাদা ও কালো রাজা। সাদা রাজা রাজার দিকে ক্যাসল করেছে, কালো রাজা ক্যাসল করেছে মন্ত্রীর দিকে।

রাজাকে ক্যাসল করার অর্থ হল যুদ্ধের সময় রাজাকে একটু নিরাপদে রাখা, এই আর কি! আসলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধলে প্রথম দিকে রাজাদের প্রায় কিছু করতেই হয় না! খেলার শেষে ঘুঁটির সংখ্যা অনেক কমে গেলে রাজা তখন একটু নিশ্চিন্তে যুদ্ধ করতে পারেন।

দিগদর্শক

'ভয়ে'র ম্যাজিক

ছোটবেলায় বাবার কাছে যে-সমস্ত রোমাঞ্চকর ঘটনা শুনেছিলাম, এবার আফ্রিকায় ইন্দ্রজাল দেখাতে এসে একে একে তা মিলিয়ে নিচ্ছি। সত্যিই আফ্রিকা এক বিচিত্র মহাদেশ এবং রোমাঞ্চকর ঘটনার খনি।

কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে ইন্দ্রজাল প্রদর্শন সেরে যাচ্ছি মোম্বাসার দিকে। সাভো জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সোজা লম্বা রাস্তা। বিরাট জঙ্গল; আট হাজার বর্গমাইলেরও বেশী ঃ আর ভেতরে নানারকম জন্তু জানোয়ার ঠাসা রয়েছে। জেব্রা, জিরাফ, সিংহ, গণ্ডার আর নানারকম হরিণের পাল তো আছেই—স্থানীয় গভর্ণমেন্টের হিসেবে বিশ হাজারের মতো হাতিও নাকি আছে এখানে।

মাঝপথে একটা বড়োসড়ো গ্রাম আছে, তার নাম 'ভয়'। নামটা বোধ হয় লোকে হিসেব করেই রেখেছিল। কারণ ওরকম ভয়াবহ জঙ্গলের মাঝখানে বিশ হাজার জংলী হাতি ঘোড়া, গ্রামের নাম 'ভয়' ছাড়া আর কি হতে পারে। যাই হোক, অনেকক্ষণ গাড়িতে বসে আছি; পায়ে যেন মরচে ধরে গেছে। একটু দাঁড়াতে পারলে ভাল হতো। আমাদের ড্রাইভার 'জর্জ কিবুকু' বললো—"একটু অপেক্ষা করুন স্যার। সামনেই 'ভয়'—সেখানে চা পাওয়া যাবে।" ভাল কথা। 'ভয়' পাবার জন্য অপেক্ষা করা যাক।

আধঘন্টা পর ভয়-গ্রামে গিয়ে পৌঁছুলাম। একটা চা এর দোকানের কাছে নামলাম সবাই। দোকানে তখন স্থানীয় লোকেদের বেশ ভিড় এবং প্রায় সব কটা চেয়ারই দখল করা। আমাদের দলের সব্বাইকে স্থান দেওয়া সম্ভব নয় এবং দেখলাম কারুরই চেয়ার ছাড়ার আশা নেই—সব্বাই বেশ আড্ডায় মশগুল। মাথায় একটা বুদ্ধি জাগলো; আমি গাড়িতে গিয়ে একটা কিছু নিয়ে এসে কোনও মতে একটা চেয়ার দখল করলাম। দোকানের কর্মচারী এসে জিজ্ঞাসা করলো, "কী খাবেন?" আমি বললাম, "লেটে চাই-ই।" অর্থাৎ এক কাপ চা দাও। বিদেশী হয়েও আমি স্থানীয় সোয়াহিলী ভাষায় কথা বললাম দেখে অনেকেরই দৃষ্টি আমার ওপর এসে পড়লো। আমি তখন করলাম কী, সবাইকে দেখিয়েই আমার ডান হাতের পাতায় জোরে জোরে ফুঁ দিয়ে বিড়-বিড় করতে লাগলাম। আর তারপর নির্দেশক আর বুড়ো আঙুলদুটোকে জোরে জোরে ঘষতে লাগলাম। এভাবে একবার ফুঁ দিই আর কিছুক্ষণ করে

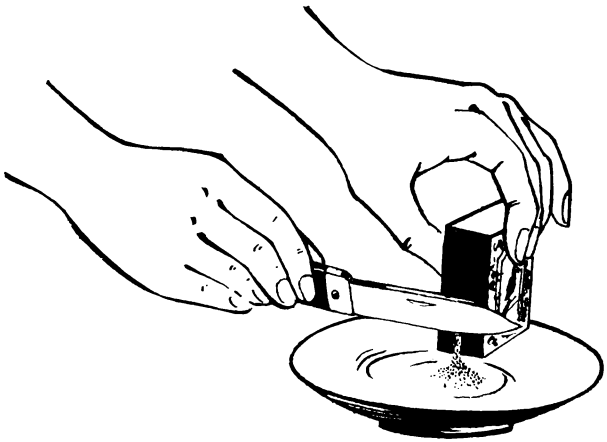

ঘষবার পর আমার আঙুল দিয়ে ধোঁয়া বেরুতে লাগলো। ধোঁয়া যখন বেশ বেরুচ্ছে তখন আমি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে আড়চোখে সবাইকে দেখতে লাগলাম। চারিদিকে সোরগোল পড়ে গেল। একজন ষণ্ডামার্কা স্থানীয় লোক গোল গোল চোখ করে দেখে হঠাৎ "বাওয়ানা মুচাবি—হাটারী" বলে চিৎকার করে পালিয়ে গেল। কথাটার মানে হচ্ছে, "মিস্টার জাদুকর এসেছে, বিপদ—।" আর কোনও কথা নেই—হুড়মুড় করে সবাই পালাতে আরম্ভ করলো। রেস্টুরেন্ট একদম ফাঁকা। আমি জানতাম আফ্রিকার এই স্থানীয় লোকজন ম্যাজিক জিনিষটাকে ভীষণ ভয় পায়। ওদের ধারণা জাদুকরেরা শখ করেই নাকি অন্যের ক্ষতি করে। বিরাট কুসংস্কার। তবে যাই হোক না কেন—রেস্টুরেন্টে চেয়ার পাওয়া গেল। সদলবলে ছাব্বিশজনই ভালভাবে বসতে পারলাম।

তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ—হাত থেকে ধোঁয়া বেরুলো কী ভাবে? মন্ত্র তো নিশ্চয়ই নয়। আসলে এটা একটা বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাপার। জাদু আমার পেশা—সেজন্য অনেক কিছুই তৈরি রাখতে হয়। এই কৌশলটাও তৈরি ছিল। দেশলাই-এর বাক্সে যে বারুদ লাগানো থাকে—সেটা হচ্ছে রেড ফস্-ফরাস। অনেকগুলো দেশলাই-এর বাক্স থেকে ঐ বারুদ ছুরি দিয়ে ঘষে একটা প্লেটে জমা করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে দেখা যাবে ঐ প্লেটের ওপর হলুদ রঙের একটা তৈলাক্ত আবরণ পড়েছে। ঐ তৈলাক্ত পদার্থ বুড়ো আঙুল আর নির্দেশক আঙুলের মধ্যে লাগিয়ে ঘষলেই ধোঁয়ার সৃষ্টি হবে। আগের থেকে আলতোভাবে ঐ পদার্থ লাগিয়ে রাখলে কারুরই চোখে পড়বে না। আমি ঐ পদার্থ আগের থেকে তৈরি করে একটা শিশিতে জমিয়ে রেখে-ছিলাম। গাড়িতে গিয়ে আঙুলে সেগুলো লাগিয়ে এসে চেয়ারে বসেছিলাম।

ঘুড়ির গল্প

কল্লোল মজুমদার

দুয়ো...দুয়ো...দুয়ো...

এক ঝাঁক ছেলের গলায় আওয়াজ উঠতেই রঙীন ময়লা ঘুড়িটা ভোকাট্টা হয়ে ভেসে গেল শূন্যে। আর বাইশটা ছেলে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাড়া করলো ওকে।

এরকম ঘটনা তোমরা নির্ঘাত অনেক দেখেছো। আর দেখবে নাই বা কেন। তোমরা নিজেরাই তো ভীষণ ভালোবাসো ঘুড়ি ওড়াতে। জ্যৈষ্ঠ মাস এলেই ঘুড়ি-লাটাই হাতে সটান বাড়ির ছাদে। আর ছাদ নেই তো বয়েই গেল। বাড়ির কাছেই পার্ক আছে। নইলে একদৌড়ে রাস্তায়। ছোটদের মত বড়োরাও কিন্তু ঘুড়ি ওড়াতে সমান ভালোবাসে। গ্রীষ্মকালের বিকেলে গড়ের মাঠে বেড়াতে যাও তো দেখবে মজা। বয়স্ক লোকদের দল ভিড় করে আছে জায়গায় জায়গায়। একজনের হাতে ঘুড়ির সুতো, অন্যজনের হাতে প্রকাণ্ড বড় বোমলাটাই। লাল-নীল-হলদে-সবুজ-ছোট-বড় কতরকমের ঘুড়ি যে উড়ছে আকাশে! গুনতে গেলে একশোটা আঙুলের কর ফুরিয়ে যাবে। কোনোটা ঈগল পাখির মত ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর-একটার ঘাড়ে। কেউবা শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস কেটে উঠে যাচ্ছে মহাশূন্যে। ঠিক যেন চাঁদের দেশে পৌঁছে তবে থামবে।

ঘুড়ি ওড়ানো খেলাটা কিন্তু বেশ প্রাচীন। তোমাদের থেকে অনেক অনেক বেশী বুড়ো। ইংরেজরা বলে, ইউরোপেই নাকি প্রথম ঘুড়ি ওড়ানো শুরু হয়। গ্রীস দেশে টারেন্টাস্ নামে একটি শহর আছে। প্রায় চোদ্দশ বছর আগে সেখানে বাস করতেন আর্কিটাস্ নামে একজন বৈজ্ঞানিক। হাওয়ার গতিবেগ নিয়ে কাজ করতে করতে হঠাৎ একদিন ঘুড়ি 'আবিষ্কার' করে ফেলেন তিনি। তবে ইংরেজদের সব কথা আমাদের মেনে নিতে হবে এমন কোন মানে নেই। পুরোনো বইপত্তর ঘাঁটলে তোমরা দেখবে ইউরোপের অনেকদিন আগে থেকেই এশিয়ার নানা দেশের মানুষ ঘুড়ি ওড়াতে ভালোবাসতো। বিশেষ করে চীন, জাপান, কোরিয়া ও মালয়েশিয়ার অধিবাসীদের কাছে এটা জাতীয় খেলার সম্মান পাচ্ছে সেই অতীত যুগ থেকে। কোনো কোনো দেশে আবার অন্ধকার রাত্রে বাড়ির ছাদ থেকে ঘুড়ি ওড়ানো হয়, যাতে পরী বা ভূত-পেত্নীর দল ভয় পেয়ে কাছে না আসে। কেমন মজার ব্যাপার তাই না! চীন-জাপানের ছেলেমেয়েরা কিন্তু উৎসবের দিনে নানান ধরনের ঘুড়ি ওড়াতে ভালোবাসে। সে-সব ঘুড়ির আকৃতিও অনেক রকমের। কোনোটা মাছ ঘুড়ি, কোনোটা লণ্ঠন ঘুড়ি, কোনোটা বা পালতোলা জাহাজের মত। দেখলে মনে হবে, বড় একটা মাছ বুঝি নীল আকাশ সাঁতরে বেড়াচ্ছে, কিংবা পাল তুলে জাহাজ চললো ভিনদেশে। আমাদের দেশের কথাই ভাবো। এই মাসের শেষেই তো বিশ্বকর্মা পুজো। সেদিন কীরকম ঘুড়ি উড়বে তা তো জানোই। ঘুড়িতে-ঘুড়িতে কলকাতার আকাশ সেদিন ছেয়ে যাবে।

তোমরা শুনলে বিশ্বাস করবে না, আগেকার দিনের খুব ধনী লোকেরা ঘুড়িতে টাকা বেঁধে ওড়াতেন। আর প্যাঁচ লড়ে ভোকাট্টা হয়ে গেলে যে পেত সেই ঘুড়ি তার কী অবস্থা বোঝ! এই ঘুড়ি কিন্তু খেলা ছাড়াও মানুষের অনেক কাজে লেগেছে। শোনা যায় কোরিয়া দেশের এক সেনাপতি যুদ্ধের সময় রাত্রে ঘুড়ি ওড়াতেন। ঘুড়ির গায়ে বাঁধা থাকতো একটি জ্বলন্ত লণ্ঠন। অন্ধকার আকাশে সেই আলো দেখে সেনাদল বুঝতে পারতো যুদ্ধক্ষেত্রে তারা কোথায় আছে। জাপান দেশেও এরকম একটি মজার গল্প চালু আছে। কবে নাকি একটা চোর নিজেকে মস্ত বড় এক ঘুড়ির সঙ্গে বেঁধে অন্য লোকের সাহায্যে আকাশে উড়িয়েছিলো। তার মতলব ছিল খুব উঁচু এক কেল্লার চূড়ার গম্বুজ থেকে সোনার মাছ চুরি করে আনা। শেষ পর্যন্ত কী হল তা অবশ্য কেউ জানে না।

তবে গপ্পটপ্প যাই থাক ঘুড়ি মানুষের অনেক উপকারে লেগেছে। আর যুদ্ধের ব্যাপারে সে এমন সব কাণ্ডকারখানা ঘটিয়েছে যে, শুনলে মনে হবে ঘুড়ি যেন বাড়ির বিশ্বাসী কুকুর। তোমরা যদি ঠাট্টা করে আমাকে জিভ ভেঙাও, আমি একটুও রাগ করবো না। উল্টে তোমাদের গল্প শোনাবো হেস্টিংসের যুদ্ধের। সেখানে ঘুড়ি উড়িয়ে কতরকমের ইশারা জানানো হত সৈন্যদলকে। অথবা সেই গল্পটা, মেরুসাগরের জমাট বরফের মধ্যে আটকে পড়েছিলো ক'টি জাহাজ আর অনেকগুলো আহত মানুষ। তাদের বাঁচাতে যখন উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়, তখন আর-একবার ঘুড়ি উড়েছিলো আকাশে। আসলে ব্যাপারটা কী হয়েছিলো জানো, ঘুড়ির গায়ে বাঁধা ছিল অটোমেটিক ক্যামেরা। আর সে ভেসে ভেসে নিখুঁত ছবি তুলে যাচ্ছিলো সব কিছুর। সতেরো শো বাহান্ন সালে পাশ্চাত্যের আর-এক মহাপণ্ডিত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ঘুড়ি ওড়াতে শুরু করলেন। সুতোতে বাঁধা ছিল ছোট্ট এক টুকরো ধাতু। গুরু গুরু বাজ ডাকছিলো আকাশে। মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে ছটফটে ফড়িঙের মত। প্রত্যেকবার বিদ্যুৎ-চমকের সঙ্গে সঙ্গে ঘুড়ির সুতোর মধ্যে তড়িৎ স্রোত বয়ে যাচ্ছিলো। আকাশের বিদ্যুতের সঙ্গে ইলেকট্রিসিটির ঘনিষ্ট সম্পর্কের কথা আগে কেউ বিশ্বাস করতো না। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন চোখে আঙুল দিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দিলেন ঘুড়ি উড়িয়ে।

ক্রিকেট বা ফুটবলের মত ঘুড়ি ওড়ানোতেও প্রতি বছর নানারকমের প্রতিযোগিতা হয়। ১৯১০ সালের ৫ মে একজন ইউরোপীয় ২৩৮৩৫ ফুট উঁচু আকাশে ঘুড়ি ওড়ান। অবশ্য সুতোর বদলে তিনি ব্যবহার করেছিলেন সরু তার। কারণ দশটা ঘুড়ির টান সামলানো তো সোজা কাজ নয়। একবার ভাবো কাণ্ডখানা! পর পর দশখানা ঘুড়ি এক তারে গেঁথে তবেই উড়িয়েছিলেন ভদ্রলোক। একজন জার্মান সেনাপতি তো ঠাট্টা করে বলেই ফেলেছিলেন, 'ঘুড়ি খুব বিশ্বাসী সৈনিক, ওকে ভালো ভালো পোশাক পরানো উচিত।' আজ থেকে মাত্র আশিনব্বুই বছর আগেও প্রায় সব যুদ্ধেই ঘুড়ির ব্যবহার ছিল খুব প্রয়োজনীয়। একতলা-দোতলা সমান ঘুড়ির গায়ে মানুষ বেঁধে আকাশে ওড়ানো হত, যাতে দূর থেকে শত্রুপক্ষের অবস্থা দেখা যায়। ১৮৯৪ সালে ক্যাপ্টেন বি এস এফ ব্যাডেন-পাওয়েল একজন সৈনিককে ১০০ ফুট উঁচুতে আকাশে উড়িয়েছিলেন। ঘুড়িটি ছিল ৩৬ ফুট লম্বা। এরকম

ছবি এঁকেছেন ॥ সুবোধ দাশগুপ্ত

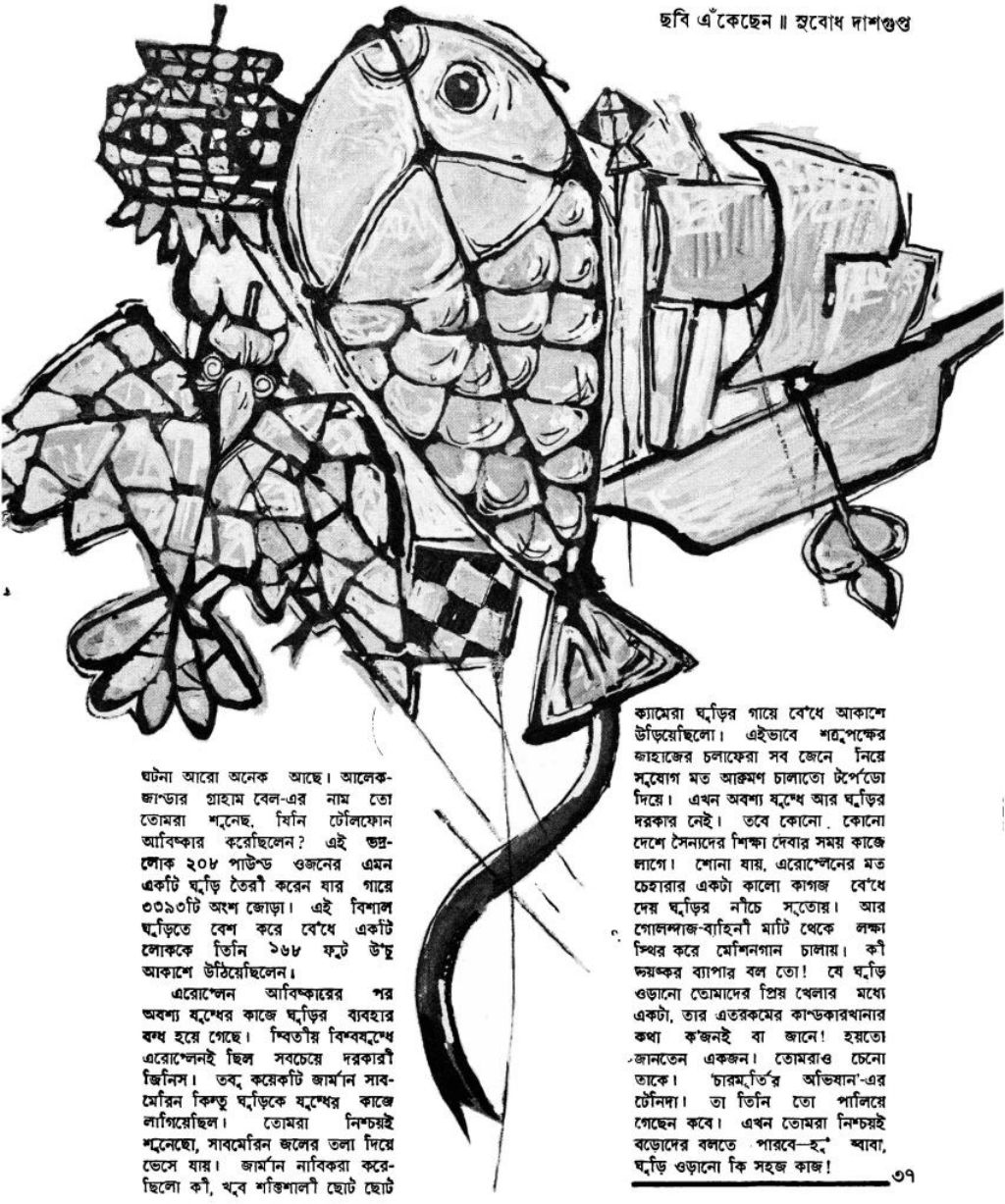

ঘটনা আরো অনেক আছে। আলেক-জাণ্ডার গ্রাহাম বেল-এর নাম তো তোমরা শুনেছ, যিনি টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন? এই ভদ্র-লোক ২০৮ পাউণ্ড ওজনের এমন একটি ঘুড়ি তৈরী করেন যার গায়ে ৩৩৯৩টি অংশ জোড়া। এই বিশাল ঘুড়িতে বেশ করে বেঁধে একটি লোককে তিনি ১৬৮ ফুট উঁচু আকাশে উঠিয়েছিলেন।

এরোপ্লেন আবিষ্কারের পর অবশ্য যুদ্ধের কাজে ঘুড়ির ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এরোপ্লেনই ছিল সবচেয়ে দরকারী জিনিস। তবু কয়েকটি জার্মান সাব-মেরিন কিন্তু ঘুড়িকে যুদ্ধের কাজে লাগিয়েছিল। তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো, সাবমেরিন জলের তলা দিয়ে ভেসে যায়। জার্মান নাবিকরা করে-ছিলো কী, খুব শক্তিশালী ছোট ছোট ক্যামেরা ঘুড়ির গায়ে বেঁধে আকাশে উড়িয়েছিলো। এইভাবে শত্রুপক্ষের জাহাজের চলাফেরা সব জেনে নিয়ে সুযোগ মত আক্রমণ চালাতো টর্পেডো দিয়ে। এখন অবশ্য যুদ্ধে আর ঘুড়ির দরকার নেই। তবে কোনো কোনো দেশে সৈন্যদের শিক্ষা দেবার সময় কাজে লাগে। শোনা যায়, এরোপ্লেনের মত চেহারার একটা কালো কাগজ বেঁধে দেয় ঘুড়ির নীচে সুতোয়। আর গোলন্দাজ-বাহিনী মাটি থেকে লক্ষ্য স্থির করে মেশিনগান চালায়। কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার বল তো! যে ঘুড়ি ওড়ানো তোমাদের প্রিয় খেলার মধ্যে একটা, তার এতরকমের কাণ্ডকারখানার কথা ক'জনই বা জানে! হয়তো জানতেন একজন। তোমরাও চেনো তাকে। 'চারমূর্তির অভিযান'-এর টেনিদা। তা তিনি তো পালিয়ে গেছেন কবে। এখন তোমরা নিশ্চয়ই বড়োদের বলতে পারবে—হুঁ বাবা, ঘুড়ি ওড়ানো কি সহজ কাজ!

রাজা হওয়ার

আগে যা ঘটেছে

বোম্বাগড় রাজ্যের মহারাজা কন্দর্পনারায়ণ একদিন তাঁর রাজপুরোহিত, মন্ত্রী, কোটাল, সেনাপতি সকলকে তাঁর দরবারে ডাকলেন। তাঁর দুই ছেলে কীর্তিনারায়ণ আর কান্তিনারায়ণ তাঁদেরও ডাকলেন। ডেকে জানালেন যে, তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়েস হয়েছে। সুতরাং রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী তিনি বানপ্রস্থে যাবেন। যাবার আগে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দুই ছেলেকে আধাআধি ভাগ করে দিয়ে যেতে চান। কিন্তু মুশকিল হয়েছে একটা মরকতমণি নিয়ে। যেহেতু মণিটাকে কেটে দু'ভাগে ভাগ করা যায় না তাই তিনি সেটা দুই ছেলের কাউকেই দিতে চান না। দিতে চান এমন একটা লোককে যে সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বোধ বলে বিবেচিত হবে। তিনি প্রস্তাব দিলেন যে, তাঁর দুই ছেলের মধ্যে যে সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বোধ লোককে খুঁজে বার করতে পারবে তাকেই তিনি সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত বলে স্থির করবেন। প্রস্তাবটা শুনে সবাই প্রথমে অবাক হয়ে গেলেন। এর পর মহারাজা বানপ্রস্থে চলে গেলেন। মন্ত্রী ভূপ-নারায়ণ সিং মহারাজার অবর্তমানে তাঁর মুকুট শূন্য-সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। কিন্তু মহারাজার দুই ছেলের মধ্যে তখন মনে-মনে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। দু'জনের মধ্যে কে সবচেয়ে বোকা লোক আবিষ্কার করতে পারবে তারই প্রতিযোগিতা। যার আবিষ্কার করা বোকা লোক দু'জনের বোকা লোকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঠিক হবে সেই ছেলেকেই মহারাজা সিংহাসনে বসবার অধিকার দেবেন।

কিন্তু ছ'মাস মাত্র সময়। এই ছ'মাসের মধ্যেই বোকা লোক বাছাই শেষ করতে হবে। সুতরাং কীর্তিনারায়ণ আর কান্তি-নারায়ণ দু'জনেই তখন ব্যস্ত হয়ে উঠলো। দু'জনেই হুকুম করলো মন্ত্রীমশাইকে—তাড়াতাড়ি বোকা লোক খুঁজে বার করে দিন। মন্ত্রীমশাই হুকুম করলেন কোটালকে। কোটাল হুকুম করলেন সেনাপতিকে। কিন্তু সারা রাজ্য খুঁজেও কোথাও বোকা লোক পাওয়া গেল না।

আসলে এই অদ্ভুত হুকুমটি ছিল মহারাজার নয়, ছিল বোম্বাগড়ের গৃহদেবতা মা বিশালাক্ষ্মী দেবীর। তিনিই স্বপ্নে মহারাজাকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এক মহারাজা ছাড়া আর কেউই জানতো না সেই স্বপ্নের কথা। কিন্তু যখন আর কিছুতেই কোথাও বোকা লোক পাওয়া গেল না, তখন একদিন মন্ত্রীমশাই ঘোড়া নিয়ে ছুটলেন মহারাজার কাছে। গিয়ে সমস্যার কথাটা মহারাজাকে খুলে বললেন।

মহারাজা বললো, বোম্বাগড়ে যদি বোকা খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে বোম্বাগড়ের বাইরে জম্বুদ্বীপে গিয়েও বোকা খুঁজে নিয়ে আসতে পারে রাজপুত্রেরা। সেই কথামত দুই রাজপুত্র দুটো জাহাজে করে বোম্বাগড় ছেড়ে জম্বুদ্বীপে যাত্রা করলো। ছোট রাজপুত্র কান্তিনারায়ণ জাহাজ থেকে নেমে জম্বুদ্বীপের একটি মন্দিরের অতিথিশালায় গিয়ে আশ্রয় পেলে। সেখান থেকে সে আর তার সঙ্গের ভৃত্য মধু রাস্তায় বেরোল বোকা খুঁজতে।

॥ পাঁচ ॥

অতিথিশালার ভেতরে খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা ভালো। কান্তিনারায়ণ দেখলে চারদিকে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কোথাও কোনও ঝামেলা নেই। সারাদিন মন্দিরে শহরের লোকেরা আসে আর ভক্তিতে গদ্‌গদ্ হয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে, নৈবেদ্য দেয় আর সঙ্গে সঙ্গে প্রণামীও দেয়।

কান্তিনারায়ণ সব লোকগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে আর চিনতে চেষ্টা করে কোন্ লোকটা বোকা। বোকা বা চালাক লোকদের তো মুখের চেহারা দেখে কিছু বোঝা যায় না। তাদের ব্যবহার দেখে কথা-বার্তা শুনে তা বুঝতে হয়। কান্তিনারায়ণ মধুকে নিয়ে তাই সকলের কথা-বার্তা-ব্যবহার লক্ষ্য করে। কেউ হয়ত ধুতি পরছে কিন্তু ঠাকুরকে নিচু হয়ে প্রণাম করতে গিয়ে তার ধুতির কাছা খুলে গেছে। তারপর মন্দির থেকে চলে যাবার সময় তার খেয়ালও নেই যে পেছন দিকে কাছা মাটিতে লুটোচ্ছে।

কান্তিনারায়ণ ব্যাপারটা দেখেই মধুকে বললে—ওই দ্যাখ্ মধু লোকটা বোকা। কাপড়ের কাছা পেছন দিকে লুটোচ্ছে সেদিকে খেয়ালই নেই, লোকটা ডাহা বোকা—

মধু বললে—না হুজুর, লোকটা বোকা নয়—

—বোকা নয় তা তুই কী করে জানলি?

মধু বললে—আজ্ঞে লোকটা আপন-ভোলা। আপন-ভোলা লোক আর বোকা লোকে অনেক তফাৎ। মনটা ঠাকুরের দিকে রয়েছে তাই নিজের কাছার দিকে কোনও খেয়াল নেই, এটা বুঝলেন না—

কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে মনে হলো। কান্তিনারায়ণ বললে—তাহলে চল্, অন্য জায়গায় গিয়ে খুঁজি—

মন্দির থেকে বেরিয়ে দুজনে শহর দেখতে বেরোল। রাস্তায় লোকজন চলেছে। সকালের সূর্য আরো ওপরে উঠেছে। একটা নিরিবিলি মত জায়গায় গিয়ে দেখলে একটা মস্ত বড় অশত্থ গাছ। তার তলায় একটা পাঠ-শালা। সেখানে কয়েকজন ছেলে গোল হয়ে বসে নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজব করছে আর তাদের গুরু-মশাই মধ্যেখানে বসে ছাত্রদের পড়াচ্ছে।

গাছের গুঁড়িটার আড়ালে দাঁড়িয়ে দু'জনে ব্যাপারটা দেখতে লাগলো। এ কী রকম পাঠশালা আর এ কী রকম পড়ানো! গুরুমশাই যত একমনে পড়াচ্ছে ছাত্ররা তত একমনে পাশের ছাত্রের সঙ্গে জোরে-জোরে গল্প-হাসাহাসি-ইয়ার্কি করছে।

কান্তিনারায়ণ গলা নিচু করে বললে—ওই দ্যাখ, গুরুমশাইটা কত বোকা! ছেলেরা যে কেউ তার পড়ানো শুনছে না তা বুঝতে পারছে না! চোখের সামনে যা ঘটছে তাও নজরে পড়ছে না—এমন বোকা লোক আর দুনিয়ায় ক'টা আছে।

মধু বললে—না ছোটবাবু, গুরুমশাই-এর দোষ নেই। ওঁর নিজের যা কাজ তাই উনি মনোযোগ দিয়ে করে যাচ্ছেন। ভদ্রলোক সৎ মানুষ, সাধুপুরুষ, প্রকৃত

ঝকমারি

বিমল মিত্র

উপন্যাস

শিক্ষক—

কান্তিনারায়ণ বললে—দূর, তুই কিছু বুঝিস না। আসলে একজন লেখা-পড়া জানা বোকা—

মধু তবু প্রতিবাদ করতে লাগলো। বললে—না হুজুর, আপনি তাহলে ওকে জিজ্ঞেস করুন—

কান্তিনারায়ণ তাই করলে। গুরুমশাই-এর কাছে গেল। বললে—গুরুমশাই, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

—কী, বলো বাবা?

কান্তিনারায়ণ বললে—আমরা এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে আপনার পড়ানো শুনছিলুম। আপনি তো দেখলুম খুবই পণ্ডিত মানুষ, খুবই বিদ্বান। কিন্তু ছাত্ররা আপনার পড়ানো শুনছে না কেবল গোলমাল করছে সেটা তো আপনি কই দেখতেই পাচ্ছেন না—আপনি কি কালা?

গুরুমশাই প্রশ্ন শুনে অবাক।

জিজ্ঞেস করলে—তোমরা কারা? কোন্ দেশের লোক?

মধু বললে—আমরা ক'দিন হলো বোম্বাগড় থেকে নতুন এসে পৌঁছিয়েছি—

গুরুমশাই টিকি দুলিয়ে বললে—ও, তাই। তাই তোমরা এই ঘটনায় অবাক হয়ে যাচ্ছো। এমন ব্যাপার

এখানকার সব পাঠশালায়। জম্বুদ্বীপের লোক এ-ঘটনা দেখে অবাক হয় না। তাদের চোখে এ স্বাভাবিক ঘটনা—

কান্তিনারায়ণ জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু তাহলে ছাত্ররা বড় হয়ে কী করবে? তারা মানুষ হবে কী করে? বড় হয়ে যখন তাদের মধ্যে আবার কেউ-কেউ গুরুমশাই হবে তখন তারা কী করে ছাত্রদের পড়াবে?

গুরুমশাই বললে—এই আমি যেমন করে পড়াচ্ছি তেমনি করেই পড়াবে। জম্বুদ্বীপে চিরকাল এই-ই চলে আসছে, চিরকাল এই-ই চলবে—

কান্তিনারায়ণ বললে—তাহলে জম্বুদ্বীপের সমাজ যে গোল্লায় যাবে—

গুরুমশাই বললে—তা যাক, তাতে আমার কী? মহারাজা তো তা বলে আমার মাইনে বন্ধ করবে না। আমি ঠিক নিয়ম করে মাইনে পেয়ে যাবো—

কথাটা শুনে কান্তিনারায়ণ আর সেখানে দাঁড়ালো না। মধুও সঙ্গে সঙ্গে হুজুরের পেছনে পেছনে চলতে লাগলো।

আসলে গুরুমশাই ফাঁকিবাজ। কান্তিনারায়ণ বললে—আমরা ভুল করেছিলুম রে, আসলে এ গুরু-মশাই ফাঁকিবাজ। ছাত্রদের স্বার্থ দেখে না, কেবল নিজের মাইনের অঙ্কটাই বোঝে।

তারপর বললে—চল্ মধু, ডান দিকে চল্, ডান দিকে মনে হচ্ছে এখানকার বাজার—

বাজারে তখন কেনা-বেচা সুরু হয়েছে পুরো দমে। সেখানে নানা রকম সওদা বিক্রি হচ্ছিল চাল ডাল তেল নুন —আরো কত রকম জিনিস। হঠাৎ একজন ব্যাপারি কান্তিনারায়ণকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে—মশাই, আপনারা কলা খাবেন?

কান্তিনারায়ণ অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—কাঁচকলা না পাকা কলা?

লোকটা বললে—পাকা কলা।

কান্তিনারায়ণ আবার জিজ্ঞেস করলে—কত দাম দিতে হবে?

লোকটা বলল—দাম দিতে হবে না, অমনি দিয়ে দেব—

—দাম নেবে না কেন? তোমার কি অনেক টাকা? তুমি কি বড়লোক?

লোকটা বললে—না মশাই, টাকা আমার নেই, আমি বড়লোক নই। আমার বাড়ির উঠোনে অনেক কলাগাছ জন্মিয়ে একেবারে জঙ্গল হয়ে গেছে। আর তাতে এত কলা হয়েছে যে বাদুড়ের অত্যাচারে আমি অস্থির হয়ে গিয়েছি। তাদের চেঁচামেচিতে আমি রাত্তিরে মোটে ঘুমোতে পারি না। তাই কলার কাঁদি কেটে বাজারের লোকদের তা বিলিয়ে দিতে এসেছি।

কান্তিনারায়ণ মধুর দিকে চাইলে। মধুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—ওরে, এ লোকটা বোকা। এতদিনে বোকা খুঁজে পেয়েছি—

মধু বুঝতে পারলে না হুজুরের কথাটা। জিজ্ঞেস করলে—কেন, কীসে বুঝলেন যে লোকটা বোকা?

কান্তিনারায়ণ বললে—দেখছিস না লোকটা নিজের কলাগাছে বেশি কলা হয়েছে বলে তা বিলিয়ে দিতে এসেছে? কলাগাছ কেটে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। তা না করে লোকের উপকার করবার জন্যে সেই কলার কাঁদি মাথায় করে বাজারে বয়ে নিয়ে এসেছে। বোকা না হলে কেউ এমন কাজ করে!

মধু বললে—তা না-ও হতে পারে হুজুর। হয়ত লোকটা সৎ। সৎ লোকও তো আছে জম্বুদ্বীপে। যদি কোনও লোকের কাছে খাবার কেনবার পয়সা না থাকে তাদের উপকার করবার জন্যে বয়ে এনেছে—

কান্তিনারায়ণ বললে—তা সেটাও তো বোকার লক্ষণ। নিজের ক্ষতি করে যদি কেউ পরের উপকার করে সেটাও তো এক-রকমের বোকামি!

মধু বললে—না হুজুর, এটা সব সময় বোকামি না-ও হতে পারে। যারা সাধুপুরুষ তারা নিজের ক্ষতি করেও পরের উপকার করে!

কান্তিনারায়ণ বললে—তুই ছাই জানিস!

মধু বললে—আজ্ঞে, না হুজুর, এত তাড়াতাড়ি কিছু ঠিক করবেন না। আরো একটু খুঁজুন। এখনও তো অনেক সময় আছে হাতে। শেষকালে হয়ত বড়-হুজুর এর চেয়ে আরো বেশি বোকা খুঁজে নিয়ে যাবেন। তখন হয়ত তাঁর কাছে আপনি বুদ্ধির খেলায় হেরে যাবেন। আপনার নিয়ে যাওয়া বোকা হয়ত তখন বড়-হুজুরের বোকার কাছে ছোট হয়ে যাবে। তখন আপনি আর রাজা হতে পারবেন না—

কান্তিনারায়ণ খানিক ভাবলে।

তারপর বললে—না, তুই মন্দ বলিস নি। তোর দেখছি মাথায় একটু-একটু বুদ্ধি আছে। তুই একেবারে পুরোপুরি বোকা নোস্।

তারপর আর একটু ভেবে বললে—দাঁড়া, লোকটাকে আর একটু পরীক্ষা করে দেখি—

বলে আবার সেই কলাওয়ালার কাছে গেল।

বললে—হ্যাঁ গো, তোমার কলা বেশ মিষ্টি হবে তো?

কলাওয়ালা বললে—মিষ্টি হবে না মানে? পাকা কলা কখনও টক্ হয়?

কান্তিনারায়ণ বললে—তোমার কলা যদি মিষ্টিই হয় তাহলে অন্য কেউ তোমার কলা নিচ্ছে না কেন?

কলাওয়ালা বললে—কেউ নিচ্ছে না তার কারণ কলা নিলে যে আমার উপকার করা হবে। জম্বুদ্বীপে তো কেউ চায় না যে কারোর ভালো হোক। এদেশে কেউ পেটে খেয়েও কারো উপকার করে না।

—তা তোমাদের দেশের লোকরা কি এতই খারাপ? বিনা পয়সায় পেলেও কেউ কারো উপকার করবে না?

কলাওয়ালা বললে—না, সেই জন্যেই তো আমার এই জ্বালা।

এবার মধু কথা বললে।

সে জিজ্ঞেস করলে—তাহলে তুমি তো এক কাজ করতে পারো। এত কষ্ট না করে কলার কাঁদিটা মাটিতে পুঁতে ফেলতে পারো। কিম্বা আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেলতেও পারো। আর তাও যদি না পারো তো কাছেই সমুদ্র, সমুদ্রের জলেও ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারো। তাহলে তোমারও মেহনত্ কমে আর তোমার উঠোনের জঙ্গলও পরিষ্কার হয়ে যায়—

কলাওয়ালা বললে—তা তো পারি বাবুমশাই, কিন্তু তাতে মনটা বড় টন্‌টন্ করে ওঠে। এত ভালো কলা কিনা মানুষের ভোগে লাগবে না, নষ্ট হবে?

—তা তোমার নিশ্চয়ই গরু আছে। সেই গরুদের খাওয়ালেই পারো। তারা এমন কলা পেলে আয়েস করে খাবে!

কলাওয়ালা বললে—গরুর কথা বলছেন? তাদের কলা খেয়ে খেয়ে অরুচি হয়ে গেছে। তারা কলা খেলে

তো আমি বেঁচেই যেতুম। কিন্তু তারা কত খাবে বলুন? তারা প্রথম প্রথম কলা খেত, কলার পাতা খেত, কলাগাছের থোড় খেত। এখন এমন অরুচি হয়েছে যে কলা দেখলে গুঁতোতে আসে—। তাই বাজারে আনলুম কষ্ট করে। ভাবলুম যদি কোনও ভিন্ দেশী লোক দেখতে পাই তো তাদের বিলিয়ে দেব—

মধু হুজুরের দিকে চাইলে। তার নিজের তখন একটু-একটু ক্ষিধেও পাচ্ছিল। তাছাড়া অনেকক্ষণ হেঁটে হেঁটে সকালের খাওয়াটা হজম হয়ে গেছে।

হুজুরের দিকে চেয়ে বললে—নেব হুজুর? মনে হচ্ছে তো কলাগুলো মিষ্টি।

তারপর কলাওয়ালার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—এ কলার নাম কী গো?

কলাওয়ালা বললে—মর্তমান কলা।

—মর্তমান মানে?

কলাওয়ালা বললে—মানে জানি না। এই কলাকে আমরা মর্তমান কলা বলি। জম্বুদ্বীপে মর্তমান কলা খুব হয়। মর্তমান কলার ছড়াছড়ি এখেনে—

কান্তিনারায়ণও কলাগুলোর দিকে মন দিয়ে দেখছিল।

মধু জিজ্ঞেস করলে—আপনি কী বলেন হুজুর, নেব কলা?

কান্তিনারায়ণ বললে—নিবি তো কিন্তু এত ভারি কলা বইতে পারবি? এতখানি রাস্তা—

মধু বললে—তা বইতে পারবো—

বলে কলার ভারি কাঁদিটা মাথায় তুলে নিলে।

কলাওয়ালা মহা খুশী। সে যেন মুক্তি পেলে। তার মুখে হাসি বেরোল। ভিন্ দেশী লোকের উপকার করতে পেরেছে বলে নয়, নিজের উপকার হয়েছে বলে

তার অত হাসি।

কান্তিনারায়ণ রাস্তা দিয়ে আবার অতিথিশালার দিকে চলতে লাগলো। পাশে পাশে মধুও চলতে লাগলো কলার ভারি কাঁদিটা মাথায় নিয়ে। তখন খাবার সময়ও হয়ে এসেছিল। অতিথিশালায় গিয়ে চান করতে হবে! চান করে উঠেই খাওয়া। খাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল বেশ ভালো। আর যদি খাবার তৈরির দেরি থাকে তাহলে শুধু কলা-ই খাওয়া যাবে। বড় বড় মাপের প্রায় এক-একটা আধপোয়া ওজনের কলা। দুটো খেলেই পেট ভরে যাবে।

মধু চলতে চলতে বললে—দেখলেন তো, কলা-ওয়ালাটা খুব ভালো হুজুর! আমি বললুম লোকটা ভালো, আপনিই কেবল তখন থেকে বলছেন লোকটা বোকা! ভালো লোক আর বোকা লোকের তফাৎ ধরা খুব শক্ত হুজুর। সবাই চিনতে পারে না—

হঠাৎ একজন লোক এসেই মধুর ঘাড়টা ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছে মধু। কে? কে তার পেছন থেকে ঘাড় ধরেছে?

দেখে একজন কোতোয়াল। তার ইয়া গোঁফ, ইয়া দশাসই চেহারা। মাথায় পাগড়ি। হাতে একটা মস্ত লম্বা লাঠি। আর তার পাশে দাঁড়িয়ে সেই কলা-ওয়ালাটা!

কলাওয়ালাটা বললে—এই দেখুন কোতোয়ালজী, এই দুজন লোক আমার কলার কাঁদি চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে—

কান্তিনারায়ণ আর মধু দুজনের মাথাতেই তখন বজ্রাঘাত।

কোতোয়াল বললে—চলো কয়েদখানায় চলো, তোমরা এর কলা চুরি করেছ কেন? চলো—

বলে তার লাঠিটা দিয়ে দুজনের পিঠে গুঁতো দিতে লাগলো।

কান্তিনারায়ণ একবার বলতে গেল—কই, আমরা তো এ কলা চুরি করিনি। ওই কলাওয়ালাই তো আমাদের অমনি দিয়ে দিলে এটা। বললে বাড়িতে জঙ্গল হয়ে যাচ্ছে তাই...

—যত সমস্ত মিথ্যে কথা তোমাদের, বিদেশ থেকে এসে আমাদের জম্বুদ্বীপে তোমরা চুরির কারবার ধরেছ? জম্বুদ্বীপের লোককে খুব ভালোমানুষ পেয়ে তাদের ঠকাবার মতলব? দেখাচ্ছি তোমাদের মজা—

বলতে বলতে তাদের কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে কয়েদখানার দিকে নিয়ে চললো। রাস্তার সমস্ত লোক হাঁ করে দেখতে লাগলো তাদের দিকে। কোতোয়ালকে জিজ্ঞেস করে তারা জানতে পারলে যে বিদেশ থেকে এই দুজন চোর এসে এই সরল মানুষটার বাগান থেকে কলার কাঁদি কেটে নিয়ে পালাচ্ছিল। সকলেই বলতে লাগলো—ছি, ছি। বিদেশীগুলো কী বদমাইশ। আসলে চোর নয় ওরা, ওরা নিশ্চয়ই গুপ্তচর। গুপ্তচরের কাজ করতেই ওরা জম্বুদ্বীপে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে শহরের সব জায়গায় রটে গেল যে বোম্বাগড় থেকে দুজন গুপ্তচর জম্বুদ্বীপে এসে গোপন খবর নিচ্ছিল, এদেশে কত সৈন্য-সামন্ত আছে, কত নৌকো, কত কামান, কত বর্শা, কত অস্ত্র-শস্ত্র আছে। তারা কোতোয়ালের হাতে ধরা পড়েছে। আরো রটে গেল যে শুধু ওই দুজনই নয়, তাদের সঙ্গে আরো অনেক গুপ্তচর জম্বুদ্বীপে এসে নেমেছে। তারা এখনও ধরা পড়েনি। শুধু গা ঢাকা দিয়ে আছে এই যা। কোতোয়ালরা তাদেরও খোঁজ করছে।

অন্ধকার একটা কয়েদখানার ভেতরে তখন কান্তি-নারায়ণ আর মধু গুম্ হয়ে বসে ছিল। সত্যিই তখন তাদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়েছিল!

মধুর তখন খুব ক্ষিধে পেয়ে গেছে। বললে—হুজুর, আমি তো আর থাকতে পারছি না, ক্ষিধের জ্বালায় আমার পেটের নাড়ি-ভুঁড়িগুলো পর্যন্ত তুকী-নাচ শুরু করেছে—

কান্তিনারায়ণ বললে—ওরে, আমারও তাই। কিন্তু কী করবো বল্? রাজা হওয়ার যে এত ঝক্‌মারি তা কি জানতুম! আগে জানলে তো রাজা হতেই চাইতুম না! বাবার মাথায় কে যে এই বুদ্ধি ঢোকালে!

(ক্রমশঃ)

ছবি এঁকেছেন ॥ সুধীর মৈত্র

ইন্দ্রমিত্র

খেলাধুলো, মাটিকাটা, রাস্তাতৈরি, দেশভ্রমণ—সব কাজেই শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়ের বিপুল উৎসাহ। শান্তিনিকেতনে তখন টাকার টানাটানি, একটা পাকা ড্রেনের কাজ আধাআধি হয়ে টাকার অভাবে বন্ধ আছে।

সন্ধ্যার পর ছেলেরা রান্নাঘরে খেতে বসেছে। হঠাৎ অধ্যাপক অজিত-কুমার চক্রবর্তী রান্নাঘরে ঢুকে চিৎকার করে বললেন—গুরুদেব নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন।

তারপর এলেন অধ্যাপক ক্ষিতি-মোহন সেন। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু তাঁকেও চঞ্চল দেখা গেল।

তারপর অধ্যাপক জগদানন্দ রায় এসে ঘোষণা করলেন যে, তিনচারদিন ছুটি।

তিনচারদিন ছুটি? একবেলা ছুটির জন্য কত ঘোরাঘুরি লাগে, কত দরখাস্ত দিতে হয়, তবু সব সময়ে ফল পাওয়া যায় না, আর না চাইতেই ছুটি?

ব্যাপার তাহলে নিশ্চয় সামান্য নয়।

তখন ছেলেরা নোবেল প্রাইজ নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করে দিল।

একটি ছেলে বলল—ওটা Noble প্রাইজ, গুরুদেব মহৎ লোক বলে তাঁকে দেওয়া হয়েছে।

আরেকটি ছেলে বলল—ওটা নভেল প্রাইজ, গুরুদেব একখানা নভেল লিখে পেয়েছেন।

এসব ১৯১৩ সালের ১৫ নভেম্বরের কথা।

নোবেল প্রাইজের টাকার পরিমাণ সেসময়ে এক লক্ষ বিশ হাজার।

প্রাইজের খবর নিয়ে টেলিগ্রাম এসেছে। রবীন্দ্রনাথ তখন চৌপাহাড়ি শালবনে বেড়াতে যাচ্ছিলেন, পথে টেলিগ্রাম পেয়েছেন। নীরবে টেলিগ্রাম-খানা পড়ে তিনি, শোনা যায়, নেপালচন্দ্রের হাতে দিয়ে বলেছেন—নিন নেপালবাবু, আপনার ড্রেন তৈরি করবার টাকা।

কে বড়? আলি, না জো লুই?

স্টাইকার

জো লুই ও মোহাম্মদ আলি। সেকালের চ্যাম্পিয়ন দেখছেন, এ-কালের চ্যাম্পিয়নের চোখের জোর কত।

"আমিই ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন", হেভিওয়েট মুষ্টি-যুদ্ধের যে-কোনো লড়াইয়ে মোহাম্মদ আলি ওই কথাটির সঙ্গে আরও বলে, "খেলার জগতে এত বড় গৌরব কার আছে? দুনিয়ায় আমায় সবাই চেনে, এই চেনাচিনি শুধু আমেরিকা অথবা ইউরোপের গণ্ডিতে আটকে নেই। এশিয়া আর আফরিকার তামাম জায়গায় ছড়িয়ে গেছে আমার নাম। বলব কী, মায় চীনের গাঁয়েও আমাকে নিয়ে কত না গল্প। আমার চ্যাম্পিয়ন আখ্যায় কোন খাদ নেই।"

আলির এই দেদার দেমাকে তার নিন্দুকেরা ভেঙচি কেটেই চুপসে যায়। আড়ালে তারা বলাবলি করে, "যে যাই বলুক, আলি জবর বক্সার। বুক ঠুকে জিতব কবুল করলে নির্ঘাত জিতবে, প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে তুড়ি মেড়ে উড়িয়ে দেয়, তার জুড়ি পাওয়া ভার। হালফিল বক্সিংয়ের যা কিছু জেল্লা তা আলিকে ঘিরেই।

সওয়া ছফুট লম্বা আলি রিংয়ের মধ্যে যেন প্রতিজ্ঞায় গম গম করে। অন্যদিকে সে পাঁকাল মাছ, তার নাগাল পাওয়া দায়। দুর্দান্ত ছটফটে। পায়ে পায়ে দারুণ যোদ্ধা সে। প্রতিপক্ষকে আওতায় পেলে শেষ করে দেয়। ঘুষির পর ঘুষিতে প্রতিপক্ষকে জেরবার করে ছাড়ে। ২১৫ পাউন্ড ওজনের আলি সারা রিংয়ে ছটফটিয়ে ঘুরে বেড়ায়। নিজের কথা বজায় রাখতে আলি অসম্ভব ঝুঁকি নেয়। লড়ার সময় ক্রমাগত তার মুখে হরেক ভাব খেলে বেড়ায়। কখনো থমথমে, কখনো টগবগে।

তেত্রিশ বছর বয়সেও রিংয়ে এবং বাইরে আলি দারুণ ব্যস্ত। পুনের বছর আগে রোম ওলিম্পিকসে লাইট-হেভিওয়েট বিভাগে আলি সোনা পায়। পেশাদার-মুষ্টিক হয়েছে এগার বছর হল। এ পর্যন্ত পঞ্চাশটি লড়াইয়ে হেরেছে মাত্র দুটিতে। আসছে অক্টোবরে সে ম্যানিলায় লড়বে জো-ফ্রেজিয়ারের সঙ্গে। ফ্রেজিয়ার এখন তার পয়লা শত্রু।

ফ্রেজিয়ারকে আলি রীতিমত সমীহ করে। চার বছর আগে তার কাছে আলি হেরেছিল। বদলা নিয়েছে গত বছর জানুয়ারিতে। অবাক কাণ্ড! প্রথমবার ফ্রেজিয়ারের কাছে ঢিট হলেও আলি-ভক্তরা ভেবেছে, আদপে আলির ওই হারে একটুকুও মান খোয়া যায়নি। সেই লড়াইয়ের আলির ডান চোয়ালে চোট লেগেছে সাংঘাতিক। গাল-ফুলো আলি তবুও ঢাক পেটায়, "আমি লড়েছি, তাই এত লোক এসেছিল, ফ্রেজিয়ারকে কে আর পাত্তা দেয়।"

কথাটা ডাহা মিথ্যে নয়। ফ্রেজিয়ার চোখের চোট ঢাকতে কালো ঠুলি লাগিয়েছে, তলপেটেও আলির ঘুষির গুতোয় বেশ জখম হয়েছে। পরেরবার মুখোমুখি হতেই আলি শোধ তুলেছে। এতে প্রমাণিত হয়, বাক্যবাগীশ আলির কথার ওজন অনেক।

চারিদিকে আলির এত সুনাম, কিন্তু ঝানু বক্সিং-বুঝদারদের চোখে আলি তেমন তালেবর নয়। তারা কেউই আলিকে মহান মুষ্টিক জো-এর সঙ্গে এক পাতে বসাতে রাজি নয়। তবে এই 'জো' এবং 'জো ফ্রেজিয়ার' আলাদা লোক।

আমরা যে জো-এর কথা বলছি, বক্সিং রিংয়ে তার আদুরে নাম "ব্রাউন বম্বার"। পুরো নাম—জোসেফ লুই বারো। বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামগুলো হরবখত বলতে হয়, তাই নামটা সবাই ছোট করে নেয়। বলে জো লুই। নামটা উচ্চারণ করলে যে কোনো বক্সিং-অনুরাগী ভক্তিতে মাথা নোয়ায়। বয়স তাঁর এখন একষট্টি চলেছে। আলিকে উনি ক্লে বলে ডাকেন, স্নেহ করেন যথেষ্ট। আলিও যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে জো লুইকে বিচার করে।

জো লুইয়ের লড়াইয়ের রেকর্ড সব বক্সারকেই ঈর্ষায় তাতিয়ে তোলে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জো লুই নেমেছেন আটষট্টিটা লড়াইয়ে। হেরেছেন মাত্র তিনবার। অপরাজিত থাকায় জো লুইয়ের রেকর্ড কেউ টপকাতে পারেনি। হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হিসাবে দীর্ঘ তেরো বছর সাতানব্বই দিন জো-লুই অপরাজিত ছিলেন।

তাঁর মুখটা গোলগাল। মাথায় ছ ফুট দেড় ইঞ্চি। আলির চেয়ে তাঁর দেহের ওজন পনর পাউন্ড কম, বুকের ছাতি দুজনেরই ৪২ ইঞ্চি। জো-লুইয়ের চেয়ে (৩৪") আলির কোমর দেড় ইঞ্চি সরু। মুঠোর ঘেরে আলির সঙ্গে তাঁর (১১½") তফাত মাত্র সিকি ইঞ্চি। দুজনেরই পরম অস্ত্র বাঁ-হাতের ঝটকা ঘুঁষি।

হামবড়াই ভাবটা আসলে আলির একটা অস্ত্র। তার মাধ্যমে সে বিপক্ষের মনে দারুণ তোলপাড় ঘটায়। রিংয়ের বাইরেও বারবার আলি রণহুঙ্কার ছেড়ে জুজুর ভয় দেখায়। জো লুই কিন্তু উল্টো ধাতের বক্সার। তাঁর নম্র আচরণে সবাই মুগ্ধ। বড় ঠাণ্ডা মেজাজ তাঁর। কথায় ঝাঁজ আদৌ নেই। দর্শকদের সঙ্গে তাঁর কখনো আকচা-আকচি হয়নি। রিংয়ের মধ্যে নিজের কাজটি তিনি মন দিয়ে গুছিয়েছেন। এরই ফাঁকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মারের ধমকে মুখ থুবড়ে পড়েছে। কিন্তু প্রতিপক্ষ পরাস্ত হবার পর জো লুইকে কখনও উৎকট উল্লাসে মেতে উঠতে দেখা যায়নি।

লড়াইয়ের শেষে বেতার-বক্তৃতায় জো-লুইয়ের ঠোঁটে প্রতিপক্ষের উদ্দেশে ঠোক্কর দেওয়া কথা আসেনি কখনও। অন্যদিকে পরাজিত বক্সারকেও সর্বদা তাঁর গুণকীর্তন করতে শোনা গেছে।

বক্সিং এমনি খেলা, যাতে রক্তপাত অবধারিত। অথচ জো লুইয়ের বিনয়ী আচরণে দর্শকের চোখে গরম ভাপ লেগেছে, টপটপ করে চোখ ফেটে জল গড়িয়েছে। এমনি একজন মানুষ নিউইয়র্কের প্রাক্তন মেয়র জিমি ওয়াকার। আমেরিকায় নিগ্রো জাতির প্রতি বিদ্বেষের ঘটনার অন্ত নেই। নিগ্রো বক্সার জো লুই তাঁর দরাজ দিলের জন্য জিমি ওয়াকারের কাছে শ্রদ্ধা পেয়েছেন। জিমি বলতেন, "জো, তুমি তোমার অননুকরণীয় ব্যবহারের মাধ্যমে অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের স্মৃতিস্তম্ভে একটি গোলাপ উপহার দিতে পেরেছ।"

জো লুইয়ের জীবন-কাহিনী যেন চুম্বকের মত সবাইকে টানে। সকলকে নাড়া দেয়। ভাইবোনে ওরা ছিল তেরটি সন্তান। জন্মভূমি আলবামার বাড়িতে ছোটবেলাতেই জো তুলোর চাষে মন দেয়। কাজ ছিল গাছ থেকে তুলে তোলা, গায়ের রং কিছুটা বাদামী। বক্সিংয়ে নাম করার পরে লোকে বলত ব্রাউন বম্বার।

জো বড় হবার আগেই তাঁর বাবা মানরো মারা যান। মা লিলি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন, এতে জো-য়ের বরাতে কোন হেরফের ঘটে নি। আইসক্রীমের কারখানায় রোজগার করে যেটুকু পেত তাও সে তার মায়ের হাতে তুলে দিত। এমনি মন্দভাগ্য যে, তার সৎ-বাবাও কিছুদিনের মধ্যে চাকরি খুইয়ে বেকার হয়ে পড়লেন। এত দারিদ্র্যের চাবুক খেয়েও জোয়ের শিরদাঁড়া নুয়ে যায়নি।

মায়ের আশা ছিল, ছেলে বেহালা-বাদক হবে। বেহালা নিয়ে কিছুদিন তিনি রেওয়াজও করেছেন। তারপর মন গেল ব্রনসন স্কুলের জিমন্যাসিয়ামের দিকে। শেষে বক্সার হওয়াই তাঁর জীবনের একমাত্র চেষ্টা হয়ে দাঁড়ায়।

ঠিকঠাক সব কিছুই এগিয়েছে। পেশাদারী বক্সারের খাতায় যখন নাম লেখালেন, জোয়ের তখন বয়স মাত্র কুড়ি। প্রথমেই তিনি মুখোমুখি হন প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন প্রিমো কর্ণারের। ছয় রাউন্ডেই প্রিমো কাত হয়েছে। এর পরই ঘায়েল হয়েছে ম্যাক্স বেয়ার।

বেয়ারের সঙ্গে লড়াইটা জোয়ের ভালরকম মনে থাকারই কথা। এ লড়াইয়ের ঘণ্টাখানেক আগে জো বিয়ে করেন। ব্যাপারটা জো-এর কাছে তেমন গুরুত্ব পায়নি, লড়াইয়ের সময়ে তাঁর উপর এ নিয়ে কোন ছাপও পড়েনি।

লড়াই-জীবনে জো একটিবার শুধু ক্লের মত কোনো লড়াইয়ের ফল নিয়ে আগ বাড়িয়ে কিছু বলেছিলেন। যদিও লড়াইয়ের ফলটা সামান্য এধার-ওধার হয়ে যায়। সু অথবা কু যে-অভ্যাসই বলা হোক না কেন—জো প্রায় সব লড়াইয়ের আগেই একচোট ঘুমিয়ে নিতেন। একবার একজন সাংবাদিক তাঁকে ঘুম থেকে টেনে তুলে লড়াইয়ে পাঠিয়ে দেন।

রিংয়ের কাজটা জো যে ভালই সারতেন, তা বলাবাহুল্য। একটি চমকপ্রদ ঘটনা ছিল বেয়ারের সঙ্গে লড়াই। বেয়ার বেধড়ক মার খেয়ে জো লুইয়ের সামনে একরকম দাঁড়াতেই পারেননি। লড়াই শেষে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেন, "আপনি জো'র সঙ্গে আবার কবে লড়ছেন?" বেয়ার আঁতকে উঠে জবাব দেন, "ঢের শিক্ষা হয়েছে। এর চেয়ে আমাকে বিষধর সাপের কুয়োয় নামতে বলুন, রাজী আছি। কিন্তু জো-এর সঙ্গে আর নয়।"

মুষ্টিক জীবনে জো অঢেল টাকা উপার্জন করেছেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, এর অর্ধেক টাকাই আয়কর বিভাগ কেটে নেয়। দিন চালাতে জো আবার প্রদর্শনী বক্সিংয়ে নেমেছেন। শেষে আয়করের টাকা মেটাতেই ফতুর। এই পাওনা চুকানোর জের, রকি মার্সিয়ানোর সঙ্গে লড়তে বাধ্য হয়েছেন অবসর নেওয়ার দু-বছর বাদেও।

সে এক করুণ দৃশ্য। টাক মাথা। সেই ক্ষিপ্রতা আর নেই। রকি'র কাছে অতি সহজে জো'কে নক-আউট

হতে হয়েছে। এতেও কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবন নিশ্চিত হয় নি. সমানে চলেছে সেই প্রদর্শনী বক্সিং।

জোয়ের স্ত্রী বুঝতে পারেন এইরকম চললে লোকটাকে আর বাঁচানো যাবে না। পাঁড়াপীড়ি করে জোকে তিনি রিংয়ে আর নামতে দেন নি। দুঃখের সংগে জোয়ের স্ত্রী বলেছেন—আমার কাছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আর জো-লুই দুজনেই একই দরের মানুষ। প্রদর্শনী বক্সিংয়ে বারবার জোয়ের যোগদান আমার ভাল লাগছে না। এ ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের ডিস ধোয়ার কাজের সামিল।

অবশেষে যুক্তরাষ্ট্র আয়কর বিভাগের টনক নড়েছে এবং জো-লুইয়ের পূর্বতন ধার্য করের বেশ কিছুটা মকুব হয়েছে।

সে দিক থেকে আলি বেশ সুখেই আছে, সারা দুনিয়ার খেলোয়াড়-মহল জানেন—বক্সিং লড়ে আলি দু-পয়সা করেছে।

আপাতত আলিকে টাকার কুমীর বলে মনে হলেও সাংবাদিকদের সে আগাম বলে রেখেছে—অবসর নিলে আপনারা নিশ্চয় খাঁতিয়ে দেখবেন বক্সিং করে আমি কি পেয়েছি না পেয়েছি। সব কিছু যোগ দিলেই টের পাবেন, আলি কতখানি বিচক্ষণ ও বুদ্ধদার লোক।

এত সব টাকার ছড়াছড়ি। কিন্তু বক্সিং জগতের পণ্ডিতমানুষদের সেদিকে নজর নেই। তাঁরা আলির বক-বকানির ভড়কি দেওয়ার বদভ্যাসেও কান পাতেন না। তাঁরা বিচার করেন আলির রিংয়ের কার্যকলাপ। রিংয়ে আলির দ্রুত পদচারণার কৌশল তাঁদের ভাল লাগে। কিন্তু তাঁরা এও জানেন যে, আলির ঘুঁষিতে তেমন ঝাঁজ নেই। তবে ঘুঁষির পাল্লার মধ্যে একবার পড়লে গা-বাঁচিয়ে পালিয়ে আসা দুষ্কর। একজন বিজ্ঞ সমালোচক আলির সম্বন্ধে বলেছেন, "আলির ঘুঁষিতে কী আর এমন জোর। মুখে তার প্রচুর বারফট্টাই আছে, থাক। আসলে, হালফিলের মাটো মন্দ-মুষ্টিকের ঝাঁকে সে একজন বুদ্ধিমান ব্যতিক্রম।" আলির কিন্তু নিজের ঘুঁষি সম্বন্ধে বিরাট নাক-উঁচু ভাব রয়েছে। তার বক্তব্য, "কখনো কখনো এত জোরে ঘুঁষি চালাই যে, আমি নিজেই চারিদিক ঠাহর করতে পারি না।"

আলি বড় না জো-লুই—এ নিয়ে মাথা চুলকে কথার পাহাড় তৈরি করা বৃথা। এই সম্বন্ধে মোক্ষম যুক্তি—দুজনে ভিন্ন যুগের মানুষ। স্থান, কাল ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের নানান হেরফেরে তাই এ তুলনা অচল। ওরা কিন্তু বক্সিংয়ের মাধ্যমে মানবজাতির মধ্যে পড়ে-পড়ে-মার-খাওয়া সম্প্রদায়ের হয়ে লড়েছে। অবিচারের বিরুদ্ধে সেই রাগটাই তাদের প্রেরণা। নিগ্রো সম্প্রদায়ের মধ্যে তারা প্রেরণার প্রতীক।

সময়ের বাঁধ ভেঙে আসছে অক্টোবরের লড়াই। যদি সেখানে আলি জো ফ্রেজিয়ারের বদলে জো-লুই-এর মুখোমুখি হত। দেখা যেত তড়বড়ে আলি তার সব অস্ত্র প্রয়োগ করেও জো-কে এঁটে উঠতে পারছে না। স্টাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আলি অপেক্ষা করছে। ২৮ বছর আগে জো-লুই যেভাবে জো-ওয়ালকটের উপর নিমেষে সাতটি ঘুঁষি কষিয়েছিল—সেই ঝড়ো গতির এক পশলা ঘুঁষি বৃষ্টির জন্য। হঠাৎ কি হল, জো-লুই নিশ্চল। দর্শককুল সমস্বরে গেয়ে উঠল, সেই নিগ্রো সংগীত—"জেগে ওঠো, শিকল ছাড়া হারাবার কিই বা আছে!"

সেরা ক্রিকেটার টাটু

মহা ফাঁপরে পড়েছিল টাটু। অতবড় ট্রফি! টাটু ঘাবড়ে গেছে। প্রায় রণজি ট্রফির ওজন। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ট্রফিটা কোলে নিয়েছে। ইডেনে পুরস্কার নিতে এসে সত্যিই সে মহা আতান্তরে পড়েছিল।

দেবাশিস চক্রবর্তী ওরফে টাটু এবারের সেরা স্কুল ক্রিকেটার। দক্ষিণ কলকাতার সার নৃপেন্দ্রনাথ ইন্সটিটুশনে ক্লাস ইলেভেনের ছাত্র। এখনই সে সেরেস ক্রিকেটার। উইকেট পাহারাদারিতে টাটু তুখোর। ব্যাট হাতে তার রানের খিদে চনচনে। উইকেটকীপার-ব্যাটসম্যান হিসাবে সে ওই প্রাইজ পেয়েছে।

টালিগঞ্জের বাড়িতে ট্রফি বয়ে নিয়ে যেতে তার এগার টাকা ট্যাক্সি খরচ লেগেছে। বাড়িতে পা দিতে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। টালিগঞ্জে অশোকনগর কলোনিতে ওদের বাড়ির চারপাশে গ্রামের ছবি। টাটু থাকে বাঁশের চাচারি-ঘেরা টালির ছাদ আর মাটির মেঝের বাড়িতে। উঠোনে একদিকে ছাঁচি কুমড়োর লতাটা ছাদে চড়বার জন্যে ছটফট করছে। পাশে পানা-পুকুর।

ফরমায়েশ হতেই টাটু কয়েক সেকেণ্ডে ড্রেস করে এল। উঠোনে ট্রফি ঘেঁষে উইকেটকীপার আর ব্যাটধারীর নানান ভঙ্গিতে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াল।

এর আগে ওদের বাড়ি থেকে কোন খেলোয়াড় বেরোয়নি। চার ভাই এক বোন ওরা। টাটু সেজ। ছাব্বিশ বছর হল ওরা কলকাতায়। আদি ভিটে বরিশালের মুইলারা গাঁয়ে। বেশ জেদী ছেলে টাটু। বয়স ষোল চলেছে।

কথায় আছে শিখিয়ে-পড়িয়ে কখনো ভাল উইকেটকীপার তৈরি করা যায় না। ওটা নাকি যার হওয়ার তার আপসে হয়। টাটুরও তাই। বেশ ডাকাবুকো উইকেটকীপার।

উইকেটকীপারকে অনবরত ওঠ-বস করতে হয়। টাটুর কাছে সেটা কোন কঠিন কাজ নয়। পায়ের কাজে তারুণ্য পোক্ত। চেহারাটা ছিপছিপে। সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা। ওজন ৫০ কেজি। সামার স্কুল টুর্নামেণ্টে টাটু দুটো সেঞ্চুরি করেছে। ১৬১ নট আউট ও ১০৬। ছাতির মাপটা তার মনে থাকে না। এ পর্যন্ত কতগুলো স্টামপিং ও ক্যাচ ধরেছে তার হিসাব গুলিয়ে ফেলে। শর্ট-হ্যাণ্ডেল ব্যাট ওর ভারী পছন্দ। ফেভারিট স্ট্রোক হুক।

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
আশ্চর্য জায়গা!
তাজ্জব কাণ্ড! আমরা স্বপ্ন দেখছি না তো?
বাড়িটার গড়ন দেখে মনে হচ্ছে দুর্গ কিংবা কারাগার। ভীষণ মজবুত।
কারাগার? এই জঙ্গলের মধ্যে? কী যা-তা বলছ?
অনেক অলিন্দ, অনেক গোপন-পথ ঘুরিয়ে দুই তরুণকে বিরাট একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে আসা হল...
ওরেব্বাবা, এ যে রাজকীয় ব্যবস্থা!
নরম গদি, প্রচুর খাবার... ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছ?
বসো কোরক। তোমার সবতাতেই সন্দেহ। আরে, আমরা এদের বন্দী নই, অতিথি, এরা লোক খুব ভাল...
কী জানি!
ওদের ভাষা বুঝতে পারলে ভাল হত।
কিন্তু ভঙ্গি বুঝতে অসুবিধে নেই। খেতে বলছে।
কীরকম যত্ন-আত্তি করছে দ্যাখো।
তা তো হল, কিন্তু এদের পুরুষমানুষরা কোথায়?
ও কিসের শব্দ?
কেউ এদিকে আসছে!
ওরেব্বাস, সেই যারা ম্যামথের পিঠে চড়ে লড়েছিল, তারাই আবার এসে হানা দিয়েছে।

এর পরে পঞ্চাশের পাতায়

উমা দাশগুপ্ত

রবিন হুডের রাজা

রবিন হুডের নাম তোমরা অনেকেই শুনেছো। যদি না শুনে থাকো, শোনা উচিত ছিল। তবে আজকালকার ছেলেদের তো কিছুই বিশ্বাস নেই। (কথাটা বলতে হয়, তাই বললুম। আসলে, আজকালকার ছেলেরাও যে দারুণ ভাল, সে আমি খুব ভালই জানি।) রবিন হুডকে যদিও বা মনে রেখে থাকো, রবিন হুডের রাজাকে নিশ্চয়ই ভুলে মেরেছো। মনে করে দেখ, বারো শতকের শেষে ইংল্যাণ্ডের রাজা সিংহহৃদয় রিচার্ড হঠাৎ ধর্মযুদ্ধের নাম করে দেশ ছেড়ে পাড়ি দিলেন। দেশে হাহাকার অনাচার। রবিন হুড তখন গরিবদের বাঁচানোর জন্য ধনুক ধরলেন। যতদিন না রিচার্ড ফেরেন, সে-ধনুক নামলো না। সিংহহৃদয় রাজা ফিরলেন। দেশে শান্তি ফিরলো। রবিন হুড ধনুক নামালেন। রূপকথার রাজত্বে সকলে চিরকাল সুখে বসবাস করতে থাকলো।

রূপকথার সঙ্গে কিন্তু ইতিহাসের তফাত আছে। রূপকথার মানুষগুলি—হয় ভাল, না হয় মন্দ। ইতিহাসের মানুষগুলি ভালয়-মন্দয় মেশানো। গরিবের বন্ধু রবিন হুড রূপকথার মানুষ। রবিন হুডের রাজা রিচার্ড ঐতিহাসিক চরিত্র। ইতিহাস বলে, সিংহহৃদয় রাজা রিচার্ড সিংহের মতই বীর ছিলেন। অমানুষিক নিষ্ঠুরও হতে পারতেন। মাথায় বুদ্ধি একটু কম ছিল বলেই সন্দেহ। মানুষটা মস্ত, যেমন লম্বা তেমন রাগী।

পতাকায় থাকতো তিন সিংহের ছবি। সিংহের মত গর্জন করে অগ্রপশ্চাৎ না-ভেবে যুদ্ধ করাই ছিল তাঁর স্বভাব। পৃথিবীর এক কোণে তখন খ্রীষ্টানে এবং মুসলমানে দারুণ লড়াই চলছে। সব লড়াকু রাজারা তখন ওই লড়াই-এ মেতেছেন। রিচার্ড ঠিক করলেন, মুসলমানদের তাড়িয়ে তিনি জেরুসালেম জয় করবেন। যীশু খ্রীষ্টের শহর জেরুসালেম পুণ্যনগরী। এই যুদ্ধে তাই সিংহ-হৃদয় রাজার আরো বেশী উৎসাহ। সঙ্গে নিলেন প্রকাণ্ড এক সৈন্যদল এবং সঙ্গে চললেন ফরাসী দেশের রাজা ফিলিপ।

মজার ব্যাপার এই, জেরুসালেম জয় করবার জন্য রিচার্ডের যদিও খুব আগ্রহ, বেশ কয়েকবছর রাস্তাতেই তিনি কাটিয়ে দিলেন। ইটালিতে লড়াই করলেন। সাইপ্রাসে লড়াই করলেন। সাইপ্রাসে, এমন কী একটা বিয়ে পর্যন্ত করলেন। অবশেষে ১১৮৯ সালে জেরু-সালেমের কাছে বিরাট দেওয়ালে ঘেরা একর শহরে উপস্থিত হলেন। এই শহরের চারদিকে তখন আশ্চর্য এক লড়াই চলেছে। মুসলমান সম্রাট সালাদিনের বীরত্বে তখন খ্রীষ্টান রাজারা কাঁপছেন। সালাদিন ছিলেন যেমন আশ্চর্য যোদ্ধা, তেমনই ভদ্রলোক। বছরের পর বছর তিনি খ্রীষ্টানদের হারিয়েছেন। বিভিন্ন শহর থেকে হটিয়ে দিয়েছেন। বহু দু'দে খ্রীষ্টান "নাইট", পরাক্রান্ত খ্রীষ্টান রাজা সালাদিনের বন্দী হয়েছেন। সালাদিন তাঁদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন মুক্তি পেলে তাঁরা এই যুদ্ধে আর থাকবেন না। তাঁরা ভদ্র ব্যবহার পেয়েছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, মুক্তি মিলেছে, আবার লড়াই করেছেন। সালাদিন হেসেছেন, আবার লড়াই-এ তাঁদের হারিয়েছেন। রিচার্ড যখন একরে এলেন, শহরটা তখন মুসলমানদের হাতে। খ্রীষ্টান রাজারা শহর অবরোধ করেছিলেন। খবর পেয়ে সালাদিন বিদ্যুৎবেগে খ্রীষ্টান সৈন্যদলের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন! খ্রীষ্টানবাহিনী তার ফলে একদিকে মুসলমান শহর আর অন্যদিকে সালাদিনের নাগপাশে আটকে গিয়েছিলেন।

রিচার্ড আসাতে সালাদিনকে কিছুটা পিছিয়ে যেতে হল। প্রচণ্ড তেজে খ্রীষ্টানরা আবার একর আক্রমণ করলেন। একরের মুসলমান সৈন্যরা তখন এক আশ্চর্য আগুনের গোলা ব্যবহার করেছিল। ডামাস্কাস্ শহরের একটি লোক একরে বসে ওই গোলা তৈরী করতো। লোকটির একটি তামার দোকান ছিল। সে তামার পাত্রে রহস্যময় এক আগুনে মশলা ভরে দিত। সেই গোলা যেখানে পড়তো, আগুন ধরিয়ে দিত। খ্রীষ্টানরা এতে খুব ব্যতিব্যস্ত হয়েছিল। ফরাসী সৈন্যরা ঠিক করলো, একরের দেওয়ালের চাইতে উঁচু এক কাঠের মীনার তৈরী করবে। সেই মীনার দেওয়ালে লাগিয়ে শহরের মধ্যে অস্ত্র বর্ষণ করবে। কিন্তু কাঠের মীনার আগুনে গোলায় পুড়ে যেত। অনেক ভেবেচিন্তে ফিলিপ তাঁর বিশাল মীনারের গায়ে তামার পাত লাগানো ঠিক করলেন। বুদ্ধিটা ভালই। তামার পাত্রে ভরা আগুনে-মশলা তামার পাত জ্বালাতে পারলো না। কিন্তু মুসলমান সেনাপতিরাও তো বোকা ছিলেন না। বেশ কিছু আগুনে-মশলা ফরাসী মীনারটির উপর পড়বার পর কোথা থেকে একটা জ্বলন্ত গাছের ডাল মীনারের উপর ছুঁড়ে দেওয়া হল। মীনার ধ্বংস হল। জ্বলন্ত মীনারে বহু ফরাসী যোদ্ধা মারা গেলেন। ফিলিপ হায়-হায় করে জ্বরে পড়লেন। একর কিন্তু অক্ষত রইল।

রাজা রিচার্ড দারুণ ক্ষেপে উঠলেন। তাঁরও খুব জ্বর হয়েছিল। কিন্তু এক সিংহগর্জনে তিনি জানালেন, জ্বর নিয়েই যুদ্ধে যাবেন। রিচার্ড কায়দাকৌশলের ধার ধারতেন না। তিনি তাঁর সৈন্যদের হুকুম দিলেন একরের দেওয়াল ভেঙে দিতে। প্রতিশ্রুতি দিলেন, যে-মানুষ একটি পাথরও সরাতে পারবে, তাকে চারটি করে সোনার মোহর উপহার দেবেন। খ্রীষ্টান সৈন্যদের একরে প্রবেশ চাই-ই চাই। তাই হল: তবে আবার আগুনের বর্ষণে যেন সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র জ্বলে উঠলো। দুইদল চারদিকে ছড়িয়ে গেল। একর শহর রইল বটে কিন্তু তিরিশ হাজার মুসলমান সৈনিকের মধ্যে মাত্র ছয় হাজার বাঁচলো। সালাদিনের ভদ্রতা বা সভ্যতা রিচার্ডের ছিল না। সাতাশ শ' মুসলমান বন্দীকে তিনি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলেন। শহরের বাইরে সালাদিনের সৈন্যবাহিনী পাগলের মত আক্রমণ চালিয়েও ব্যর্থ হল। বিপদের পর বিপদ, একর শহরে দেখা দিল দারুণ সব মহামারী। সিংহহৃদয় তখন সমুদ্রের তীর বেয়ে জেরুসালেমের দিকে রওনা দিলেন। সালাদিনও পিছু নিলেন।

পথেই লড়াই বেধে গেল। কিন্তু রিচার্ডের বীরত্বে মুসলমানদের আক্রমণ কেবলই ব্যর্থ হতে লাগল। রিচার্ড জেরুসালেমের বন্দর জাফা অধিকার করলেন। সালাদিন একটা রাত প্রার্থনায় কাটালেন। প্রচণ্ড তেজে যুদ্ধ চলল। দারুণ চেষ্টায় সালাদিন তখন জাফা থেকে জেরুসালেম যাওয়ার রাস্তা সম্পূর্ণ নিজের দখলে আনতে পারলেন। এ সত্ত্বেও রিচার্ড তাঁর সিংহপতাকা উড়িয়ে শত্রুদমনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এর চাইতে বেশী কিছু করা কিন্তু আর সম্ভব হল না। রিচার্ডের মত মানুষকেও স্বীকার করতে হল, জেরুসালেম বিজয় তাঁর অসাধ্য। তাছাড়া ততদিনে মুসলমান সেনানীর সভ্য ব্যবহারে রিচার্ড কিছুটা মুগ্ধও হয়েছিলেন। বিশেষ করে সালাদিনের ছেলে এল আদিলকে তাঁর ভাল লেগে গিয়েছিল। হঠাৎ রাজা এক আশ্চর্য প্রস্তাব আনলেন। এল আদিলের সঙ্গে তাঁর ছোট বোন জোনের বিয়ে দেওয়া হোক। এল আদিল এবং জোন জেরুসালেমে রাজত্ব করুক। মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদের লড়াই-এর শেষ হোক। হলে খুবই ভাল হত, কিন্তু এমন কি হয়? ধর্মভীরু সালাদিন এই প্রস্তাবে রাজী হতেন কিনা বলা শক্ত। রাজকুমারী জোন কিন্তু সম্পূর্ণ বেঁকে বসলেন। ইতিমধ্যে খবর এল রিচার্ডের রাজ্যে বিপদ, ইংল্যাণ্ডে গণ্ডগোল। ধর্মযুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে রিচার্ড বাড়ির দিকে ছুটলেন। এ হেন রাজার দেশে ফেরায় ইংল্যাণ্ডের অবস্থা কিছুটা ভাল হয়েছিল বই কি, কিন্তু তারপরে ইংরেজরা চিরকাল সুখে বসবাস করেছিল এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। তার মানে, জীবনটা রূপকথা নয়।

ছবি এঁকেছেন ॥ সুবোধ দাশগুপ্ত

কোরক, বুড়ী কী বলছে? একটু বুঝিয়ে দাও। এরা আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে চায়?
হুনলাকার কাছে!

অথচ হুনলাকা যে কে, আমি জানি না। এই মেয়েগুলো কি তারই যোদ্ধা? তাও জানিনা। শুধু জানি যে, যে-কোনও পুরুষ এই দুর্গে ঢুকুক, হুনলাকার হাতে তার মৃত্যু অনিবার্য।
অর্থাৎ আমরাও মরব? বলো কী?

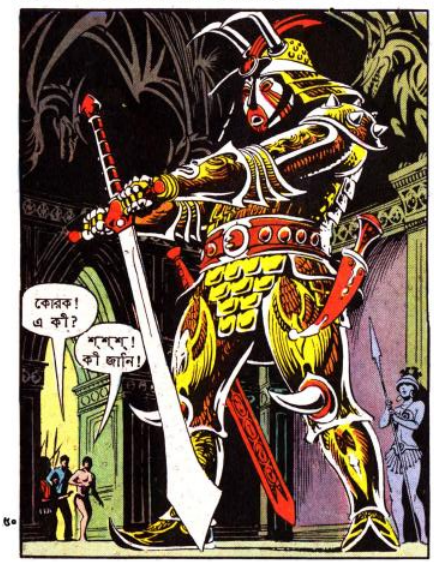
কোরক! এ কী?
শশশে! কী জানি!

ভাট্!
স্টাবাক্! মার্কে!

মেয়েরা তোমাদের লুকিয়ে রেখেছিল শুনে হুনলাকা রেগে গেছে! ওর সঙ্গে তোমাদের লড়তে হবে!
কেন? না না, যুদ্ধ-টুদ্ধ করার কোনও ইচ্ছেই আমাদের নেই!

তোমাদের বয়স কম, তাই হুনলাকা বলছে যে, ইচ্ছে হলে এই দুটো ছোরা নিয়ে ওর সঙ্গে তোমরা লড়তে পারো।

এর পর আগামী সংখ্যায়

আজব চিড়িয়াখানা

বহুরূপী

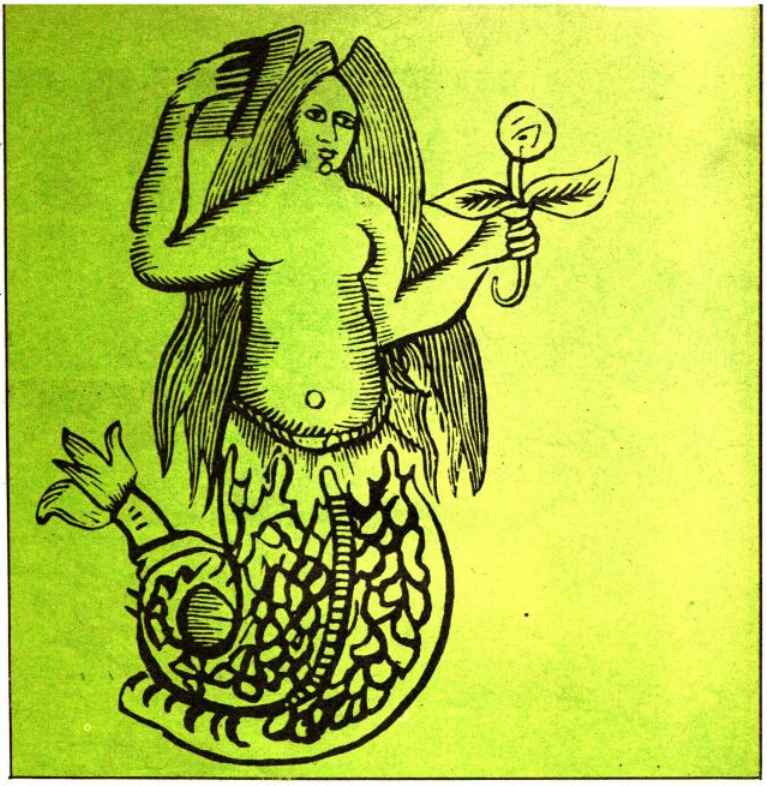

মৎস্য-কুমারীদের কে না চেনে? তারা সাগর-তলে প্রবালপুরীতে থাকে। সাতমহলা বাড়ি তাদের। তারা ঢেউয়ের সঙ্গে খেলে। জলঘেরা পাথরে বসে রোদ্দুরে চুল শুকোয়। মানুষ দেখলেই ঝুপ করে আবার জলে পালিয়ে যায়। অর্ধেক তাদের মানুষের মতো, বাকী অর্ধেক মাছের মতো।

তাদের খবর প্রথম শোনা গিয়েছিল নাবিকদের মুখে। সাতসমুদ্র ঘুরে বেড়ায় তারা। ফিরে এসে কত রাজ্যের কত গল্প। জলের নানান খবর। শোনা গেল, জলে শুধু হাতিঘোড়া নয়, দেবতা এবং মানুষও আছে। ডাঙায় যেমন নানা ধরনের মানুষ, জলেও তেমনি। রাজা, প্রজা, পাদরী—সবাই রয়েছেন। এদের মধ্যে দেখবার মতো মৎস্য-কুমারীরা। ফুটফুটে চেহারা। ডাগর ডাগর চোখ। মাথা-ভরতি সোনালী চুল। তবে কী জানো, মৎস্য-কুমারীরা বড্ড দুষ্টু। ওরা নাবিকদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। তারপর ভুলিয়ে-ভালিয়ে জাহাজটিকে ডুবিয়ে দেয়।

মৎস্য-কুমারীদের এক বোন সাইরেন। আদ্যিকালে সাইরেনদের যারা নিজের চোখে দেখেছে, তারা সবাই একবাক্যে বলে, সাইরেনরা ঠিক মৎস্য-কুমারীদের মতো নয়। অর্ধেক তাদের যদি মানুষের মতো, তবে কোমর থেকে নীচের দিকে পাখির মতো। পরে শোনা গেল, এসব নাকি চোখের ভুল। এই জল-কন্যারাও মৎস্য-কন্যাদেরই মতো। পাখির কথা মনে করিয়ে দেয় তারা গলার সুরে। সাইরেনরা এমন মিষ্টি সুরে গান গায় যে, তার তুলনা নেই। গান গেয়ে ওরা নাবিকদের ঘুম পাড়িয়ে দেয়। তারপর তাদের মেরে ফেলে। গ্রীক বীর ইউলিসিস তা-ই তাঁর জাহাজের নাবিকদের কান মোম দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিলেন। আর-একজন, অরফিউস, নিজেই এমন গান জুড়লেন যে, সাইরেনদের আর চালাকি খাটলো না। অরফিউসের গলার কাছে কোথায় লাগে তাদের গান। লজ্জায় তারা সেদিন জলে ঝাঁপ দিয়েছিল। পরীর মতো মেয়েরা নিমেষে কয় খণ্ড পাথর হয়ে গেল।

শুধু নাবিক কেন, অন্যেরাও নিজেদের চোখে দেখেছেন মৎস্য-কন্যাদের। তবে দু'চার মাসের মধ্যে নয়, শত শত বছর আগে। মানুষের হাতে ধরা পড়ার পর একজন নাকি তাঁত চালাতে শিখেছিল। আর-একজন নাকি প্রতি রোববার চার্চে যেত। হতে পারে এসব গুজব। তবে গল্পের বইয়ের পাতায় যে-সব মৎস্য-কন্যা আর জলপরীর দল, তাদের কিন্তু গুজব বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। পুরী কিংবা দিঘায় বেড়াতে গিয়ে আজ আর যদি মাঝ-সমুদ্রে মৎস্য-কন্যাদের দেখা না যায়, সে দোষ কিন্তু ওদের নয়, মানুষেরই। মানুষই এখন মাছের মতো। জলের তলায় সে ডুবুরী। ডুবো-জাহাজ নিয়ে চতুর্দিকে তার দৌড়া-দৌড়ি। সমুদ্র তোলপাড়। কোথায় থাকবে বেচারা মৎস্য-কুমারী? বাধ্য হয়েই হয়তো তারা আজ মনের দুঃখে পালিয়ে গেছে বনে।

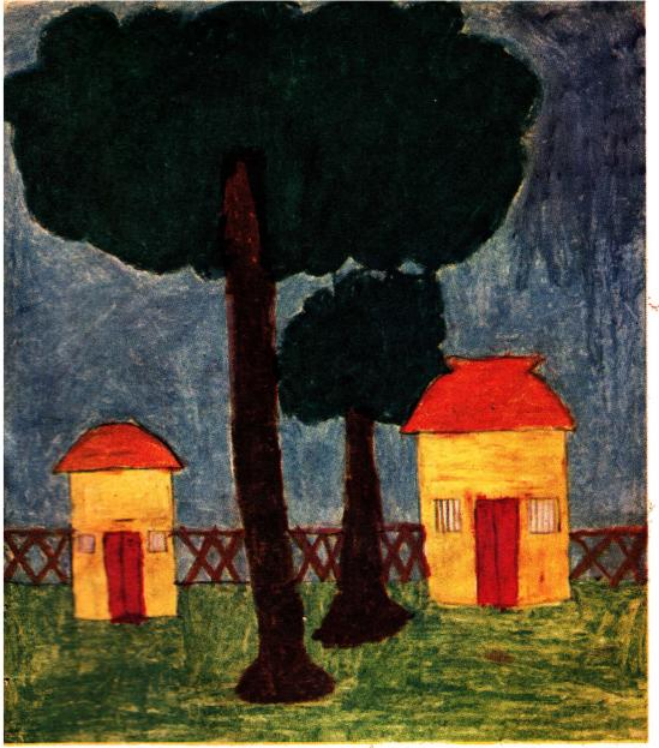

ছবি ॥ [illegible] চৌধুরী (বয়স ৮)

তোমাদের চিঠি

ছোটদের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার মতো তেমন কোন সর্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকা ছিল না বললেই চলে। আনন্দমেলা প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা শিশু সাহিত্যে একটি নতুন যুগের সূচনা হল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ছোটদের রুচিবান করে তুলতে হলে 'আনন্দমেলা'-র প্রয়োজন অপরিহার্য।

'আনন্দমেলা'-র দ্বিতীয় সংখ্যায় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অসাধারণ ছড়া 'হুল্লোবিল্লি' পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। রচনাটির সঙ্গে পূর্ণেন্দু পত্রীর আঁকা ছবি থাকায়, 'হুল্লোবিল্লি' পড়ে বাড়ির কচি-কাঁচা ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে বুড়ো-বুড়ীরাও খুব মজা পেয়েছে। অমিতাভ চৌধুরীর লেখাটিও চমৎকার। বিমল করের ধারাবাহিক উপন্যাস বিশেষভাবে লোভনীয়। শিল্পীদের আঁকা প্রত্যেকটি ছবিই চমৎকার।

আশা করি, আনন্দমেলার প্রত্যেকটি সংখ্যাতেই আমরা এভাবে শিশু-সাহিত্য পাঠের আনন্দকে ছোট-বড়ো সবাই মিলে সমানভাবে ভাগ করে নিতে পারবো।

—কাজী মুরশিদুল আরেফিন,
চব্বিশ পরগণা।

পড়ে খুব ভাল লাগলো। আনন্দমেলা খুব রঙচঙে বেরিয়েছে। ধাঁধার পাতা, গল্প সবগুলো, নিয়মিত বিভাগ, উপন্যাস সত্যিই পড়ে ভাল লাগলো।

—গৌতম কর।

তোমাদের ধাঁধা

১। কোন জিনিস বাজার থেকে কিনে এনে রান্না করে না-খেয়েই ফেলে দেওয়া হয়?

২। কাজের সময়ে ছুঁড়ে ফেলে, কাজ না থাকলে গুছিয়ে তোলে?

৩। এমন একটি তিন অক্ষরের শব্দের নাম, তার প্রথম অক্ষরটি দিয়ে দুঃখ বোঝায় ও পরের দুটি অক্ষর দিয়ে হাসিঠাট্টা বা আনন্দ বোঝায়?

ধাঁধার উত্তর

১। তেজপাতা, ২। জাল, ৩। হা-তুড়ি।

ঊর্মি গঙ্গোপাধ্যায়
(বয়স ১০)

তোমাদের পাতা

আমি কি হবো

আমার জ্যাঠা আছেন, জ্যেঠী আছেন,
আছেন বাবা—মা
আমার কাকা আছেন, কাকী আছেন,
আছেন মামা—মামীমা।
জ্যাঠা বলেন, মানুষ হয়ো,
জ্যেঠী বলেন—না, ডাক্তার।
বাবা বলেন—মন্ত্রী হয়ো,
মা বলেন—না, ব্যারিস্টার।
কাকা বলেন—মাস্টার হয়ো,
কাকী বলেন—না, ইঞ্জিনিয়ার।
মামা বলেন—খেলোয়াড় হয়ো,
মামী বলেন—না, জজ।
আমি কি হবো—আমি কি জানি,
না তাঁরাই জানেন?

তমালকুমার চট্টোপাধ্যায়
(৮ বছর)

আজব কথা

তিড়িং, বিড়িং, তিড়িং,
ঐ চলেছে নেকড়েমামা,
সঙ্গে নিয়ে ফড়িং,
বর হয়েছে নেকড়েমামা,
বউ হয়েছে হরিণ!
তিড়িং, বিড়িং, তিড়িং,

বাজনা বাজায় গাধামশাই,
হা-কুর, হাকুর, হা—
ঐ চলেছে ঘোমটা দিয়ে
নেকড়ে মামার মা,
তাল দিচ্ছে শেয়ালমামা,
বাহবা! বা! বা! বা!

শরিতা দে
(বয়স ১০)

সাধন উপাধ্যায়

বাসুকি যখন নড়েন

গত ৮ই জুলাই বিকেল ৫টা বেজে ৩৬ মিনিট ৭ সেকেণ্ডে হঠাৎ কলকাতা শহরের মাটি কেঁপে উঠল পর পর দুবার। শুধু কলকাতা কেন সারা পূর্ব ভারতেই সেদিন বিকেলে ভূমিকম্প হয়েছিল। অনেকে বলছেন, গত দশ বছরের মধ্যে এরকম জোরালো ভূমিকম্প আর পূর্ব-ভারতে হয়নি। পুরাণের গল্প অনুসারে নাগ বাসুকি তাঁর ফণার ওপর পৃথিবীকে ধারণ করে রেখেছেন—তিনি যখন মাথা নাড়ান তখন পৃথিবীও কাঁপতে থাকে। অর্থাৎ বাসুকি যখন নড়েন তখনই পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয়। পুরাণের এই গল্পের সঙ্গে কিন্তু আজকের বৈজ্ঞানিকদের মতের দারুণ অমিল রয়েছে।

একটা পুকুরের জলে যদি একটা ঢিল ছুঁড়ে ফেলা হয় তাহলে দেখা যাবে সেই ঢিল পড়ার জায়গা থেকে অনেক তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমশ ছোট হয়ে মিলিয়ে যায়—ভূমিকম্পও অনেকটা সেইরকমই ব্যাপার। মাটির নীচের শিলাস্তর যদি কোন কারণে হঠাৎ কেঁপে ওঠে তাহলে জলের ঢেউয়ের মতো সেই কম্পনও ছড়িয়ে পড়বে শিলাস্তরের চারিদিকে। শিলাস্তরের এই কম্পনকেই বলা হয় ভূমিকম্প। যে বিন্দুতে ভূমিকম্পের উৎপত্তি সেখানে সাধারণত কম্পন হবে প্রবল—ক্রমশ দূরে দূরে তা মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে আসবে। ভূমিকম্প সাধারণত নানা কারণে হতে পারে। যেখানে এখনও পাহাড় গড়ার কাজ চলেছে সেইখানেই সাধারণত ভূমিকম্প সবচেয়ে বেশী হয়। এছাড়াও যেখানে আগ্নেয়গিরি আছে সেখানেও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূমিকম্প হয়। কোন পার্বত্য অঞ্চলে ধস্ নামলেও অনেক সময় সেখানকার মাটি কেঁপে ওঠে। মাটির তলায় গ্যাস সঞ্চিত হলেও অনেক সময় তা মাটি ভেদ করে বেরোবার সময় ভূমিকম্প ঘটায়। পৃথিবীর ভেতরের উত্তপ্ত অংশ ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। উত্তপ্ত পদার্থের আয়তন বেশী ঠাণ্ডা হয়ে গেলে যখন আয়তন কমে যায় তখনও অনেক সময় শিলাস্তরে ভূমিকম্প হয়।

পাহাড় বা দ্বীপের শিলাস্তরে কিংবা সমতল এবং মালভূমিতেও অনেক জায়গায় বড় বড় ফাটল থাকে—তাকে বলা হয় চ্যুতি। এই চ্যুতির রেখা ধরে যখন হঠাৎ কিছু শিলা নড়ে ওঠে তখন তার ফলে যে কম্পন, তাকেই বলা হয় ভূমিকম্প। অনেক সময় শক্ত শিলাস্তরে নতুন কোন ফাটলের সৃষ্টি হয় কিংবা দুটি চ্যুতির মাঝখানের শিলায় একটার সঙ্গে আর-একটার প্রবল ঘর্ষণ হয়, তখনই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। মনে করো, এলোমেলোভাবে থাক থাক করে অনেক বই রাখা আছে ও তার ওপর টান টান করে একটা চাদর পাতা আছে। এই চাদর হল ভূপৃষ্ঠ আর বইগুলো হল শিলাস্তর। চাদরের নীচের এলোমেলো করে রাখা কিছু বই যদি হঠাৎ পড়ে যায় চাদরও কেঁপে উঠবে। ঠিক সেইরকম ভাবেই মাটির নীচের এলোমেলো শিলাস্তর যদি খানিকটা খসে গিয়ে আর একটা শিলাস্তরের ওপর গিয়ে পড়ে তাহলেই পৃথিবীর মাটি কেঁপে ওঠে।

হাওয়া অফিসে একরকম যন্ত্র থাকে যাতে কোথাও ভূমিকম্প ঘটলেই তা ধরা পড়ে। যন্ত্রটির নাম সিসমোগ্রাফ। এই সিসমোগ্রাফ নানা রকমের হয়। এগুলির কয়েকটির নাম হল মিলেন-শ সিসমোগ্রাফ, ওমারি সিসমোগ্রাফ প্রভৃতি। সাধারণ সিসমোগ্রাফে একটা ছোট বেদীর ওপর একটা সিলিণ্ডার বসানো থাকে। সিলিণ্ডারের মধ্যে এমন-সব মেশিন লাগানো থাকে যাতে মাটি একটু কাঁপলেই সিলিণ্ডার ঘুরতে থাকবে ও কাঁপতে থাকবে। সিলিণ্ডারের ওপর কালির ভূষি মাখান থাকে। সিলিণ্ডারের ঠিক ওপরেই দুটো সূক্ষ্ম নিবের কলম লাগানো আছে—একটিতে সিলিণ্ডারের কম্পন অনুসারে আনুভূমিক কম্পনের দাগ পড়ে আর অন্যটিতে লম্বালম্বি অর্থাৎ উল্লম্ব দাগ পড়ে।

ভূমিকম্পে বেশির ভাগ ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি হয় শহর ও ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ার জন্য। এই সব ভূমিকম্পের ফলে রেল লাইন, রেল ব্রিজ, ঘরবাড়ি ভেঙে যায়। জাপানে ভূমিকম্পের সময় সমুদ্রে একরকম প্রবল ঢেউ দেখা যায়, তাকে বলা হয় সুনেমিস্। ১৯৭৫ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে যে ভূমিকম্প হয়েছিল, সেইটিই বোধহয় সাম্প্রতিক কালের পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প। প্রথমে পশ্চিম দিকের সমুদ্রের নীচের খানিকটা অংশ ভূমিকম্পের ফলে নিচু হয়ে বসে গেল—সমুদ্রের জল খানিকটা সরে গেল। তারপর সমুদ্রের জল ৪০ ফুট উঁচু এক একটা প্রচণ্ড ঢেউ হয়ে উপকূলে আছড়ে পড়ে সমস্ত শহর ধ্বংস করে দিল। ছয় মিনিট সময়ের মধ্যে ৭০ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটল। ১৮৯৭ সালে আসামে যে ভূমিকম্প হয়েছিল তার কম্পন এতোই তীব্র ছিল যে, এক মিনিটের মধ্যে মাটি ২০০ বারেরও বেশি কেঁপেছিল। ১৯২৩ সালে জাপানে যে ভূমিকম্প হয়েছিল তার ফলে ২৫,০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ১৯২০ সালে চীনের কানসুতে যে ভূমিকম্প হয়েছিল তার ফলে ২,০০,০০০ মানুষ মারা যায়। ১৯৭২ সালে মারা যায় ১,০০,০০০। ১৯৩৪ সালে ভারতবর্ষে বিহারের ভূমিকম্পের ফলে ৮০০ লোকের মৃত্যু হয়েছিল।

তোমাদের মনের মতো রঙীন পূজাবার্ষিকী

আনন্দমেলা

আনন্দমেলা রঙীন পূজাবার্ষিকী—বলতেই ঝলমল ক'রে ওঠে চোখ, মন ভ'রে ওঠে খুশিতে। শুধু ছোটোদেরই নয়; ছোটোদের চেয়ে যারা আর একটু বড়ো, এমনকি যারা পুরোপুরি বড়ো, তাদেরও। হবেই বা না কেন! রঙে, রেখায় আর মন-ভোলানো লেখায় আনন্দমেলা রঙীন পূজাবার্ষিকীর জুড়ি নেই যে! আর ছোটোদের মনের মতো রঙীন পূজাবার্ষিকী বলতে এখন একটাই—আনন্দমেলা: পূজোর হৈ-চৈ মজার মধ্যে তোমাদের সারাক্ষণের সঙ্গী। জবর খবর, গত বছর আনন্দমেলা রঙীন পূজাবার্ষিকী যা দিয়েছে, এবার তার চেয়ে অনেক বেশি বই কম দেবে না। পুরো খবর ক্রমশ বেরুবে, কিন্তু বিশেষ-বিশেষ লেখাগুলো সম্পর্কে এখনই জেনে রাখো:

তিনটি বড় উপন্যাস

সত্যজিৎ রায়, সুবোধ ঘোষ, মতি নন্দী

চারটি বড়ো গল্প

শংকর, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন ঘোষ

সঙ্গে বাঘা-বাঘা লেখকদের অনেকগুলো

গল্প এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মস্ত বড়ো ভ্রমণকাহিনী।

ছড়া: অন্নদাশংকর রায়, অমিতাভ চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

আর প্রত্যেক লেখার সঙ্গেই থাকবে রঙচঙে ছবি।

এছাড়াও এবারের আনন্দমেলায় থাকবে আরো অনেক কিছু—জনপ্রিয় ক্রিকেট ও ফুটবল খেলোয়াড়দের রঙীন ছবি আর গল্প, মজার খেলা, ধাঁধা এবং আরও কতো কি!

এবারের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণের কথাটা কিন্তু এখনও বলা হয়নি। তা হলো:

পরীক্ষার্থীদের জন্যে

সামনেই যারা পরীক্ষা দেবে তাদের জন্যে এমনই একটা ফিচার—যা শুধু দারুণ কাজেরই নয়, যা পড়ার জন্যে সত্যিকারের কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে।

আনন্দমেলা

আজই যিনি তোমাদের কাগজ দেন তাঁকে ব'লে রাখো,
বা, আমাদের লেখো:
সার্কুলেশন ম্যানেজার, আনন্দবাজার পত্রিকা,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১

দাম: ৮.০০ টাকা ॥ সডাক: ৯.৪০

AMC-2 BEN

ANANDAMELA

দেড় টাকা

আনন্দমেলা